দাম : দশ টাকা

কংগ্রেসে প্রণববাবু এখন গান্ধীজীর মতোই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন — পৃঃ ৩১

স্বস্তিকা

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকলে আগামী দু'দশকে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে — পৃঃ ৩৫

৭০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২ জুলাই ২০১৮।। ১৭ আষাঢ় - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

আপোশহীন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।।

৭০ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ১৭ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২ জুলাই - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কড়া ব্যবস্থা নিলে মোদীর জনপ্রিয়তা বাড়বে ▯ গূঢ়পুরুষ **▯ ৬**

বাঙালি হিন্দুর রক্ষাকর্তা শ্যামাপ্রসাদ
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা **▯ ৭**

মোহন ভাগবত ও প্রণব মুখার্জি দু'জনেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক
▯ ড. মনমোহন বৈদ্য **▯ ৮**

হিন্দু বাঙালি ও ড. শ্যামাপ্রসাদ ▯ বিজয় আঢ্য **▯ ১১**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান
▯ প্রণব দত্ত মজুমদার **▯ ১৫**

ড. শ্যামাপ্রসাদের নামে শিয়ালদা স্টেশনের নাম রাখার সময় এসেছে ▯ দেবব্রত চৌধুরী **▯ ১৭**

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যাত্রাপালা
▯ দীপক কুমার ঘোষ **▯ ১৯**

সময় এসেছে হৃদয় দিয়ে কাশ্মীরি জনগণের মন জয় করার
▯ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ প্রাঃ) **▯ ২১**

একটি ঐতিহাসিক পত্র— সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদের গর্জন ▯ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় **▯ ২৩**

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতী
▯ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় **▯ ২৬**

কংগ্রেসে প্রণববাবু এখন গান্ধীজির মতোই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন▯ সাধন কুমার পাল **▯ ৩১**

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকলে আগামী দু'দশকে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে পড়বে▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ অঙ্গনা : ৪২

▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা

কবি লিখেছিলেন, 'রথযাত্রা লোকারণ্য, মহা ধুমধাম / ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।' কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। পঞ্জিকা মতে হিন্দুধর্মে যতগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব রয়েছে তার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অন্যতম। পুরাণ অনুযায়ী, এদিন জগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রা মাসির বাড়িতে যাত্রা করেন। আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জগন্নাথদেবের এই যাত্রায় সঙ্গী হন। সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয় পূজা প্রার্থনা এবং উৎসব। স্বস্তিকাও এই উৎসবের অংশীদার হতে চায়। তাই আগামী সংখ্যায় থাকবে জগন্নাথদেবের এবং তাঁর রথযাত্রা নিয়ে মনোজ্ঞ রচনা। লিখবেন উজ্জ্বল মণ্ডল, জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস পাকিস্তান প্রেমে বিভোর

১৯৪৭ সাল হইতেই কাশ্মীর সমস্যাগ্রস্ত। ভারতের বীর সেনানীরা পাকিস্তানের গ্রাস হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করা সত্ত্বেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাইয়া এই সমস্যাকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস দলটি ৭০ বৎসর ধরিয়া কোনওরূপ সদিচ্ছা দেখাইতে পারে নাই। বরং ভোটের লোভে তাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ইন্ধন জোগাইয়াছে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হইবার পর কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জন্য নানাবিধ জনকল্যাণকর প্রকল্প গ্রহণ করিয়া তথাকার যুবসমাজকে মূলস্রোতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ২০১৬ সালে পিডিপি-বিজেপি জোট সরকার গঠন করিয়া উপত্যকায় শান্তি ফিরাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির উগ্রবাদীদের প্রতি নরম মনোভাবে বিরক্ত হইয়া বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। রমজান উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উপত্যকায় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় সংঘর্ষ বিরতির দাবি মানিয়া লইয়াছেন। সংঘর্ষ বিরতির সুযোগে জঙ্গিরা সক্রিয় হইয়া উঠিয়া সেনাবাহিনীর জওয়ানের রক্তে উপত্যকার মাটি লাল করিয়াছে।

কংগ্রেস কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহে। তাহারা একই খেলা খেলিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় সেনার প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা ও সন্ত্রাসীদের প্রতি তাহাদের দরদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মন্তব্যে উগ্রবাদীরা ও পাকিস্তান খুশি হইয়া পড়িয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ বলিয়াছেন কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার গুলিতে সাধারণ নাগরিক বেশি প্রাণ হারাইয়াছেন। এমনকী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার চক্রান্তের মতো অভিযোগও তুলিয়াছেন। ইহার পরেই কংগ্রেসের আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী সৈফুদ্দিন সোজ বলিয়াছেন কাশ্মীর স্বাধীনতা চায়।

কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতার মন্তব্যে দেশবাসী হতবাক হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের কবল হইতে কাশ্মীরকে যে সেনাবাহিনী রক্ষা করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কংগ্রেসিদের মতো ভণ্ড দেশপ্রেমিকরাই করিতে পারে। এই ভণ্ডামি তাহাদের মজ্জাগত। তাঁহারা যখন ক্ষমতায় আসেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দ হইতে চ্যুত হইলেই এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রলাপ বকিয়া জঙ্গি ও পাকিস্তানের মনোবল বাড়াইয়া দেন। দেশ ও জাতির প্রতি ইহাদের দায়বদ্ধতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বরং ইহাদের বহু নেতা পাকিস্তান ও জঙ্গিপ্রেমে বিভোর। সুখের বিষয় হইল, জোট সরকারের বাধ্যবাধকতা আর না থাকিবার ফলে কাশ্মীরকে সন্ত্রাসমুক্ত করিতে নামিয়াছে সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হইতেই জঙ্গি দমনে অল আউটে নামিয়া ২১ জন 'মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি'-র তালিকা বানাইয়াছে নিরাপত্তা বাহিনী। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে এই তালিকার চার শীর্ষস্থানীয় জঙ্গি খতম হইয়াছে। জঙ্গি দমন অভিযানের মধ্যে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সহ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা যাহাতে আর নূতন করিয়া উস্কানিমূলক বক্তব্য না রাখিতে পারেন তাহার জন্য দেশবাসীকে সজাগ থাকিতে হইবে। ভারত-কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্ম-বলিদানের মাসেই ভারত সরকার কাশ্মীর প্রসঙ্গে যে অনমনীয় মনোভাব দেখাইলেন তাহা নিশ্চিতভাবে তাঁহার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারত-কেশরীর আত্মবলিদান ব্যর্থ হইবে না।

সুভাষিতম্

ছাগযুদ্ধমৃষিশ্রাদ্ধং প্রভাতে মেঘডম্বরম্।

দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।। (চাণক্যনীতি)

ছাগলের যুদ্ধ, মুনিদের শ্রাদ্ধ, প্রভাতের মেঘাড়ম্বর এবং স্বামী-স্ত্রীর কহল ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হয় না।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কড়া ব্যবস্থা নিলে মোদীর জনপ্রিয়তা বাড়বে

গূঢ় পুরুষের কলম

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পিডিপি-বিজেপির মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়েছে। এটাই হওয়ার কথা ছিল। কারণ, এই দুটি দলের নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য প্রথমদিন থেকেই ছিল পরস্পর বিরোধী। ২০১৫-র মার্চে পিডিপি-বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপির মন্ত্রীরা যেখানে ভারতমাতা কী জয় বলেছিলেন সেখানে পিডিপি মন্ত্রীরা আল্লার নামে শপথ নেন। সেই অনুষ্ঠানে বিজেপির মন্ত্রীরা যখন শপথ নেন তখন পিডিপির সমর্থকদের একজনও হাততালি দেননি। অর্থাৎ গত তিন বছরে দুই শরিকের সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। তবু বিজেপি জোট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল জম্মুতে বসবাসকারী হিন্দুদের প্রাণরক্ষার তাগিদে। মেহবুবা পাকপন্থী জঙ্গিদের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়েছেন। এমনকী, সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করার পর সারা দেশে যখন মানুষ ধিক্কার দিচ্ছেন তখনও মেহবুবা মুফতি এবং তাঁর দল বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এতেই বোঝা যায় যে পিডিপি কতটা সমর্থন করে পাক জঙ্গিদের।

তিন বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় মেহবুবা ক্ষমতায় থাকাকালে কাশ্মীর উপত্যকায় তুলনামূলকভাবে পাক জঙ্গি হানার ঘটনা বেড়েছে। পিডিপির সঙ্গে জোট সরকার ভাঙার পিছনে বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়েছে যে গত তিন বছরে কাশ্মীরে এক হাজারের বেশি সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এইসব হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫০ জন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর ২৩৬ জন জওয়ান। এই সময়ে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে ৫৫৫ জন সন্ত্রাসবাদী। এর আগে, যখন ন্যাশানাল কনফারেন্সের সরকার ছিল তখন ৯৫২টি সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এইসব ঘটনায় প্রাণহানি হয় ১০২ জন সাধারণ নাগরিকের। সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে প্রাণ হারান ১৫৯ জন জওয়ান। সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৪১৩ জন জঙ্গির। কাশ্মীরের মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে তাই কড়া জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য দ্বিতীয় বিকল্প ছিল না কেন্দ্রীয় সরকারের। 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতি ছাড়া জিহাদের বাস্তব প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

মেহবুবা মুফতি সরকারের প্রবল বাধায় এই নীতি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছিল না। মৃত জঙ্গিদের 'জানাজা' মিছিলে ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়ে জিহাদের বীজ বপন করছে পাক সন্ত্রাসবাদীরা। কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল জানাজায় উত্তেজক স্লোগান দেওয়া পদযাত্রা বন্ধ করতে। শান্তি বজায় রাখার কথা বলে কাশ্মীরের মেহবুবা সরকার তা করতে দেয়নি। সেনাবাহিনী কাশ্মীরে সন্ত্রাস বিরোধী বড়সড় অভিযান চালাতে চেয়েছিল। তাতে বাধা দেয় মুফতি সরকার। স্থানীয় মানুষের ভাবাবেগের কথা বলে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ছিল মুফতি সরকারের বিরুদ্ধে।

মেহবুবা মুফতির পদত্যাগের পরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দেয় যে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এখন থেকে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলতে হবে। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ থাকবে। আগত ২৮ জুন থেকে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। এই তীর্থযাত্রার সময় জঙ্গিরা আত্মঘাতী হামলা চালাবার পরিকল্পনা করেছে। এর পিছনে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসা আই এস জঙ্গিরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে আগাম জানিয়েছে। তাই কাশ্মীরে জঙ্গি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেনাবাহিনীর শক্তি দশগুণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। নিঃসন্দেহে এটাই মেহবুবা মুফতি সরকারের বিদায়ের পর সব থেকে বড় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। একটা কথা বলা যেতে পারে আগামীদিনে পাক জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কড়া প্রত্যাঘাতের জবাবে পাকিস্তান যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করতে পারে। মোদী সরকার যে পাক হুমকিতে পিছু হঠবে না তা আগাম বলে দেওয়া যেতে পারে। মানবাধিকারের ধ্বজাধারী সেকুলারবাদীরা যতই চিৎকার করুক না কেন তাতে কিছুই লাভ হবে না। যেমন, মুফতি সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার পরেও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি সাধারণ মানুষের। বরং সন্ত্রাসবাদ যে মোদী সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করবে না সেই বার্তাই গেছে মানুষের কাছে।

কাশ্মীরে কড়া ব্যবস্থা নিলে সারা ভারতে বিজেপি তথা মোদী সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়বে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সন্ত্রাসবাদ নিশ্চিহ্ন করার কাজে সমর্থন জানাতে বাধ্য হবে। অন্যথা তারা দেশবিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত হবে। ভারতে সন্ত্রাসবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানকে কিছুটা শিক্ষা দিতে পারলে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির জয়রথ আটকানো যাবে না। কারণ, জম্মু-কাশ্মীরের শাসনভার এখন পুরোপুরি মোদী সরকারের হাতে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না যে কেন্দ্রের দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা অনুদানের সিংহভাগ খরচ হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জন্য। উন্নয়নের অনুদানের ১০ শতাংশ বরাদ্দ পায়নি হিন্দু প্রধান এলাকা জম্মু এবং বৌদ্ধ প্রধান লাদাখ। স্বাধীনতার পর থেকে জম্মু এবং লাদাখ বিমাতার সন্তান। মুসলমান তোষণের এতবড় নোংরা উদাহরণ ভারতে আর দ্বিতীয় একটি নেই। আমরা আশা করবো রাষ্ট্রপতির শাসনের সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু এবং লাদাখের অ-মুসলিম বাসিন্দাদের প্রতি সুবিচার করবে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

বাঙালি হিন্দুর রক্ষাকর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে রহস্যজনক ভাবে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু সে মৃত্যু শরীরের। তাঁর কীর্তি আজও অক্ষত। ভারত ভাগের ইতিহাস, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জন্মের ইতিহাস যতবার লেখা হবে, ততবারই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। কেননা তিনিই এই পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা, বাঙালি হিন্দুর রক্ষাকর্তা। এ সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪০-৪৪-এর জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু সহাসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪১-এর ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২-এর ২০ নভেম্বর পর্যন্ত এ.কে. ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে আগস্ট আন্দোলনে বাংলার গভর্নরের দমননীতির প্রতিবাদে বাংলা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৩-৪৫ পর্যন্ত বাংলার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৬ সালে কুখ্যাত কলকাতা দাঙ্গায় বিপুল প্রাণক্ষয় হয়। চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলতে থাকে। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সাহায্য দান করতে থাকেন। তিনি হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। সুরাবর্দি ও শরৎ বসুর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্ত বাংলা পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতায় আন্দোলনে নামেন। সেই সময় হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতেই বাংলার কংগ্রেস দল

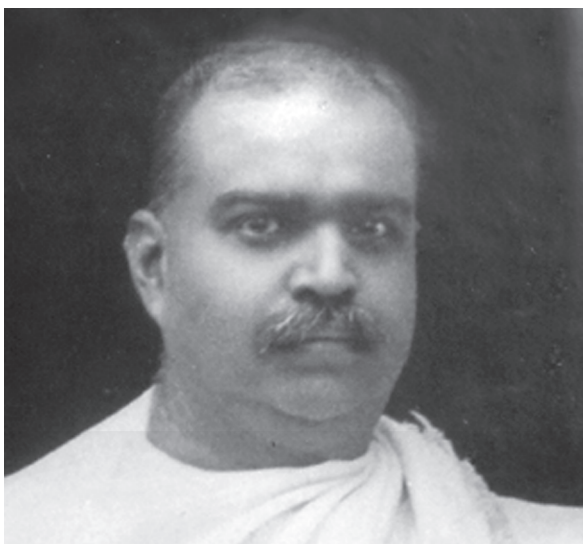

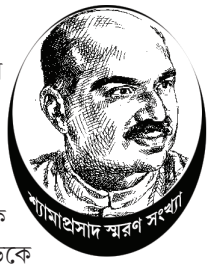

নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দুগরিষ্ঠ ও মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি তোলে। এতে মুসলমানদের টনক নড়ল। এতদিন তারা 'হাতে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' গেয়েছে বুক চিতিয়ে, এখন তারা বুঝতে পারল নিজেদের তৈরি অস্ত্রেই তারা ঘায়েল হতে চলেছে। তাঁর সেই আন্দোলনে বাংলার এক অংশ এবং পঞ্জাবের এক অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে রেখে দেওয়া সম্ভব হয়। পূর্ব পঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ নামক সেই অংশদুটি পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে সেই পশ্চিমবঙ্গকে ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী ভারত বিদ্বেষী এবং হিন্দু বিদ্বেষীরা পুনরায় আর এক ইসলামি রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টায় রয়েছেন।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে ড. মুখার্জি যোগ দেন। ১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কর হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হয়। পাকিস্তানের প্রতি তোষণ নীতির ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য হওয়ায় ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ড. মুখার্জি পদত্যাগ করেন।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লিতে ড. মুখার্জির সভাপতিত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয় যার বর্তমানরূপ ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯৫২-তে সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো কাশ্মীরেও বিনা পারমিটে প্রবেশের অধিকার দাবি করে এবং কাশ্মীরের জন্য আলাদা নিশান, আলাদা বিধান ও আলাদা প্রধান-এর প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ করলে গ্রেপ্তার হন। শ্রীনগরে এক পরিত্যক্ত গেস্ট হাউসে তাঁকে বন্দি রাখা হয়। বন্দিদশায় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলে অচিকিৎসা ও ভুল চিকিৎসায় ২৩ জুন নির্জন নির্বান্ধব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। লোকে বলে মৃত্যু নয় হত্যা করা হয়েছে। ২৪ জুন কলকাতায় বিশাল শোক মিছিল সহকারে শবযাত্রা ও মরদেহ সৎকার করা হয়।

আজ যারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভোটের লোভে কেউ প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস খেয়ে, কেউ হিজাব পরে, নমাজ পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করে হিন্দুদের পদদলিত করে রেখে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পায়ে তৈলমর্দন করে চলেছেন, তাঁরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা দুর্বল হলে পশ্চিমবঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ থাকবে না, হয়ে যাবে ইসলামি পশ্চিমবাংলাদেশ। সেই লক্ষণই ফুটে উঠছে।

সুগত বসু (নেতাজির নাতি) কোনও এক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন— ''বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে বাঙালি কী চোখে দেখবে।'' তিনি আরও লিখেছেন— ''বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে যদি আমরা বাঙালির নায়ক বা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসাবে মানতে চাই, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, লাটসাহেব কার্জনকেই আমাদের পুজোর বেদিতে বসিয়ে আরাধনা করা উচিত।'' সুগত বসুরা যতখুশি কার্জনের আরাধনা করুন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী বাঙালি তাদের পরিত্রাতারূপে শ্যামাপ্রসাদকেই পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত করেছে। শিব আর বানরের তফাত বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাদের লোপ পায়নি। ■

বিশেষ নিবন্ধ

মোহন ভাগবত এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক

ড. মনমোহন বৈদ্য

নিজের লোকেদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড. প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁকে বিশেষ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মস্থানে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। রেশিমবাগ স্মৃতি মন্দিরে ডাক্তার হেডগেওয়ার ও শ্রীগুরুজীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মনের কথা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। অনুষ্ঠানের আগে সঙ্ঘের পদাধিকারী ও বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব ছিল। নাগপুর মহানগর সঙ্ঘচালকের অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রণববাবু বলেন সবাই নিজের নিজের পরিচয় দেবেন। তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি প্রণব মুখার্জি'। তাঁর এই সরলতা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

প্রণববাবু তাঁর ভাষণ ইংরেজিতে লিখে এনেছিলেন। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর ভাষণ হিন্দিতে রাখেন। দু'জনের ভাষণেই 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'-র ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। দু'জনেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রায় একই কথা বলেছেন। প্রণববাবু পরিষ্কার ভাবে বলেন যে, পাশ্চাত্যের রাজ্যভিত্তিক রাষ্ট্রধারণা এবং ভারতের জীবনদৃষ্টি ভিত্তিক রাষ্ট্রধারণা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি পাঁচ হাজার বছরের নিরন্তর প্রবহমান সংস্কৃতির কথা বলেন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' পরম্পরার কথা উল্লেখ করেন এবং সহিষ্ণুতা, বিবিধতা, সেকুলারিজম্ ও সংবিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর ভাষণে একই কথা বলেছেন। কিন্তু শব্দ একটু আলাদা ছিল। তিনি 'সহিষ্ণুতা'র স্থানে 'সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলা'র কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যে-কোনও ভারতীয়র জন্য অন্য কোনও ভারতীয় পর হতে পারে না। কারণ সবার পূর্বপুরুষ এক। উপাসনা পদ্ধতি, ভাষা অথবা বংশের ভিত্তিতে নয়, বরং জীবনদৃষ্টি ও জীবনমূল্যের ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রজীবন বিকশিত হয়েছে। এবং এটিই ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের ভিত্তি। এ দু'টিই তিনি প্রতিপাদন করেছেন। তিনি পরে অন্য প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলেন— সঙ্ঘ সঙ্ঘই থাকবে, প্রণববাবু প্রণববাবুই থাকবেন।

প্রণববাবু ও মোহনরাও ভাগবত দু'জনের ভাষণেই ভারতের পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীনত্ব, বহুত্ববাদ, বিবিধতা এবং সারা বিশ্বকে এক পরিবার মনে করার জীবনদৃষ্টি ও পরম্পরার গৌরবময় উল্লেখ হয়েছে। এই জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধ ভারতের সংবিধানেও অভিব্যক্ত হয়েছে। এজন্য এই সংববিধান আমাদের ঐতিহ্য। এই ভারতের এক সময় অংশ ছিল যে পাকিস্তান, তারও সংবিধান ভারতের সংবিধান তৈরির সময়কালেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাদের সংবিধানে এই উদারতা, বহুত্ববাদ ও বিবিধতাকে মান্য করার কথা নেই। এখন প্রশ্ন হলো, দুটি একই সমাজ ও দেশের অংশ ছিল, তবু এরকম কেন হলো? এর কারণ হলো ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক এবং সর্বাঙ্গীণ যে জীবনদৃষ্টি যাকে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু জীবনদৃষ্টি (Hindu view of Life) বলেছেন— পাকিস্তান তা অস্বীকার করছে, আর ভারত তা গ্রহণ করেছে। এই উদাত্ত জীবনমূল্য ভারতের প্রাচীন, একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ জীবনদৃষ্টির পরিণাম। এই মূল্যবোধ আমরা সংবিধান থেকে নয়, সংবিধানের দ্বারা পেয়েছি। খলিল জিব্রানের 'আপকে বচ্চে' নামে এক কবিতা রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন—

'তোমার সন্তান, তোমার সন্তান নয়।
ও বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছার অভিব্যক্তি।
ও তোমার থেকে আসে না, তোমার দ্বারা আসে।
ও তোমার কাছে রয়েছে, কিন্তু তুমি ওর মালিক নও।'

আমাদের সংবিধানের জন্য আমরা এরকম নই। হাজার হাজার বছর থেকে আমরা এরকম, তাই আমাদের সংবিধান এভাবে তৈরি করা হয়েছে। তার সম্মান ও মান্যতা সবাইকে করতে হবে। সঙ্ঘ এই কাজই নিরন্তর করে চলেছে। স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে দু'বার সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। সে সময় সংবিধানসম্মত পথে যে সত্যাগ্রহ করা হয়েছিল তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, দেশব্যাপী, শান্তিপূর্ণ এবং অনুশাসনে ভরপুর ছিল। অন্য কোনও দল বা সংগঠনের এরকম ইতিহাস নেই। সঙ্ঘকে সংবিধান বিরোধী, অগণতান্ত্রিক, হিংস্র ইত্যাদি মিথ্যা প্রচারকারী কোনও সংগঠন বা যারা নিজেদের সংবিধান স্বীকৃত বলে দাবি করে তাদের ইতিহাসে সঙ্ঘের সত্যাগ্রহের মতো দেশব্যাপী, শান্তিপূর্ণ ও অনুশাসনবদ্ধতার কোনও উদাহরণ নেই। বরং এর উলটো। সংবিধানের ধ্বজাধারী হয়ে হিংসার পথ গ্রহণ, নিজ দেশের সেনাবাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলাকারীদের সমর্থন ও সঙ্গদানকারী লোকেরা সঙ্ঘকে সংবিধানের পাঠ পড়ানোর কথা বলছে— এ অত্যন্ত হাস্যকর। গত ২ এপ্রিল কেবলমাত্র বিজেপি শাসিত ছয় রাজ্যে 'ভারত-বন্ধ'-এর সময় ব্যাপক হিংসার সমর্থনে রাহুল গান্ধী-সহ সমস্ত সেকুলার, লিবারাল নেতা প্রকাশ্যে দাঁড়িয়েছেন— এ রকমই এদের সংবিধান নিষ্ঠা।

নাগপুরে প্রণববাবুর ভাষণের পর বিরোধিতাকারীদের প্রতিক্রিয়ারও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ও চিন্তার জগতে কমিউনিস্টদের ক্ষয়িষ্ণু উপস্থিতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। এদের মতবাদ অভারতীয় হওয়ার কারণে এদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও উদারতা ও সহিষ্ণুতার অভাব থাকা স্বাভাবিক। এদের বক্তব্য : প্রণবদা সঙ্ঘকে আয়না দেখিয়েছেন। সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে সেকুলারিজম্ ও নেহরুর নাম উচ্চারণ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখার মতো কথা হলো যে, প্রণববাবুর নাগপুর আসার বিরোধিতাকারীদের মধ্যে কেউই মোহনজীর ভাষণের বিষয়ে কিছু বলেননি। হতে পারে তাঁরা সেই ভাষণ শোনেননি। সম্ভবত তাঁরা তা শোনার যোগ্যই

নন। কারণ এরা ডগম্যাটিক। 'আমরা কোনও নতুন কথা শুনব না; আমরাই ঠিক, তোমরা ভুল পথের; আমরা যা বলছি সেটাই ঠিক'। সম্ভবত এদের জন্যই জর্জ অরওয়েল তাঁর 'অ্যানিমাল ফার্ম' উপন্যাসে লিখেছেন, 'চার পা ভালো, দুই পা খারাপ।' আবার 'দুই পা'-র কথা যারা শোনে তারাই ঈশ্বরনিন্দুক হয়েছে।

খেয়াল করলেই বোঝা যাবে বহুত্ববাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা অন্তর্নিহিত। তবুও এর মধ্যে অসহিষ্ণু আচরণকারীরাও রয়েছেন। কিন্তু একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। হিন্দুত্বের দৃষ্টিতে সারা বিশ্ব এক পরিবার। কিন্তু 'চার পা-ই ভালো' মনেকারীরা অজ্ঞানের অন্ধকারেই থাকতে চান। এদের নেতিবাচক সমস্ত প্রবন্ধে কেউই নিজকে অনুভব করেন না। কারণ হলো সঙ্ঘকে কাছে থেকে দেখা ও জানা এদের কাছে তাদের রীতির প্রতি বিদ্রোহ করার মতো মহা অপরাধ ও ব্লাসফেমি সদৃশ। সেজন্য সরসঙ্ঘচালক কী বললেন তা তাদের কাছে শোনার মতো বিষয়ই নয়। কয়েকমাস আগে আমার আগ্রায় এক খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা সঙ্ঘের বিষয়ে বহু প্রশ্ন করেছেন। তাঁরা সঙ্ঘকে কাছে থেকে দেখেছেন। যদি কেউ সঙ্ঘকে খ্রিস্টান বিরোধী বলে তবে তাঁরা তাদের প্রশ্ন করেন : এ কি আপনার নিজের অনুভব? আপনি কি সঙ্ঘের কোনও পদাধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছেন? সঙ্ঘ বিষয়ক কোনও পুস্তক পড়েছেন? এর সমস্ত উত্তর আসে নেতিবাচক। আগ্রায় যখন আমি আসি তখন তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বিশপের সঙ্গে তাঁরা আমার কথাবার্তার ব্যবস্থাও করেন। আমি বিশপের দপ্তরে গিয়েছি। কথাবার্তা ভালো হয়েছে। এরকম খোলামেলা ব্যবহার ও খোলা মন সঙ্ঘ- বিরোধীদের কোথায়?

জরুরি অবস্থার সময় একটি মারাঠি কবিতা পড়েছিলাম। তার অনুবাদ এরকম : 'হ্যাঁ বলা যাদের অভ্যাস না বলা তাদের বুদ্ধিতে আসে না আর না বলা যাদের অভ্যাস তাদের কাছে হ্যাঁ-এর কোনও স্থান নেই।' অনুরূপভাবে, আমাদের বহুত্ববাদের মধ্যে অসহিষ্ণুদের স্থান তো আছে। কিন্তু অসহিষ্ণুরা তো বহুত্ববাদকে সহ্য করে না।

সরসঙ্ঘচালক যখন দেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তখন সমাজের গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে দেখা করেন। একবার এক বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে আলাপচারিতার সময় শিল্পপতি হিন্দু না বলে ভারতীয় বলার পরামর্শ দেন। তখন মোহনরাও বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে এই দুই শব্দের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। ভারত শব্দের সঙ্গে এক প্রাদেশিক সম্পর্ক আসে, কিন্তু হিন্দু শব্দ সম্পূর্ণ রূপে গুণাত্মক। এজন্য পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেও তারিক ফতেহ্ নিজেকে হিন্দু বলতে পারেন, বলেনও। সেজন্য আপনি ভারতীয় বলুন, আমরা হিন্দু বলবো, অন্য কেউ ইন্ডিয়া বলবে। আমরা এটা বুঝি যে, সবাই একই কথা বলছেন। এটাকেই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলা হয়। কিন্তু একথা ডগম্যাটিক ও ফ্যাসিস্ট কমিউনিস্টরা মানে না। এদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে টলারেন্স, সেকুলার, নেহরু, মার্কস ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ ও হিন্দুত্বের নিন্দা না করেন তাহলে আপনার বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত থাকবে না। আপনি 'টলারেট'-এর যোগ্যও থাকবেন না। এজন্য কমিউনিস্টদের স্বর্গরাজ্য কেরলে সঙ্ঘের কাজ করার কারণে ১৯৬৫ সালের মার্চ থেকে ২০১৭-র মে পর্যন্ত ২৩৩ জন সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে তারা হত্যা করেছে। এই সংখ্যার ৬০ শতাংশ কার্যকর্তা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে সঙ্ঘে এসেছিলেন।

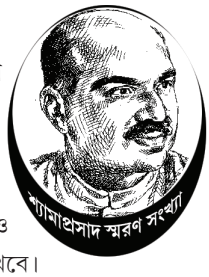

হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বসমাবেশক সংস্কৃতির কল্পনা আপনি যাই বোঝান, কমিউনিস্ট ও তাদের সহচররা তাকে সংকীর্ণ, বিভাজনমূলক, বিভেদকারীই বলবে। কারণ তারা এরকমই ভেবে রেখেছে। বহু আগের কোনও চিঠিপত্র, কোনও মন্তব্য কেটে ছেঁটে প্রসঙ্গহীন ভাবে তারা লিখবে। সঙ্ঘের অধিকারীরা কী বলছেন তা তারা শুনবে না। কারণ একটাই— 'দুই পা খারাপ।' তারা চোখ বন্ধ করে থাকলেও সঙ্ঘের মধ্যে মুসলমান ও খ্রিস্টান স্বয়ংসেবক আসা বন্ধ হবে না। সঙ্ঘের মধ্যে বহু প্রশিক্ষিত মুসলমান ও খ্রিস্টান কার্যকর্তা রয়েছেন। হিন্দু হিসেবে আমরা ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করি না। এজন্য বহু বছর ধরে স্বয়ংসেবক হয়েও তারা নিজের নিজের উপাসনা পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেছেন। ১৯৯৮ সালে বিদর্ভ প্রান্তের তিনদিনের শিবিরে ৩০ হাজার স্বয়ংসেবক গণবেশে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ওই তিনদিন শুক্র, শনি ও রবিবার ছিল। শনিবারের ব্রত রাখা স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা নেওয়া হচ্ছিল। তখন জানা গেল সেটি রমজান মাস এবং কিছু স্বয়ংসেবক রোজা রেখেছেন। তাঁদের সংখ্যা ১২২। তাদের জন্য রাত দেড়টা থেকে রোজাভঙ্গের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রমজান মাস যদি না হতো তাহলে শিবিরে মুসলমান স্বয়ংসেবক রয়েছেন তা বোঝাই যেত না।

লিবারাল, সেকুলার, উদার ইত্যাদি নেতার বয়ান একটু মনোযোগ সহকারে পড়া যায় তাদের অগণতান্ত্রিক, সংকুচিত, কট্টর, সাম্প্রদায়িক ও হীন মনের, যা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত চরিত্রে একেবারে বিপরীত তা খুব শীঘ্র উপলব্ধি করা যাবে। প্রণববাবু সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে আসার কারণে আবার একবার এদের মুখোশ খুলে পড়ল। তারা বলছে যে, প্রণববাবু সঙ্ঘকে আয়না দেখিয়েছেন। সঙ্ঘ প্রতি বছর চিন্তন বৈঠক ও অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় বৈঠকে নিজেরাই আয়নায় নিজেদের দেখে থাকে। সঙ্ঘের কাজের, পথের ও কার্যপদ্ধতির সিংহবলোকন, আত্মাবলোকন করে তার মূল্যায়ন করেই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনও করা হয়। এই গত এপ্রিল মাসেই পুনায় এক চিন্তন বৈঠক হয়েছে। কিন্তু নিজেদের প্রগতিশীল বলা কুসংস্কারবাদী এবং উদার বলা অসহিষ্ণু ও কট্টরবাদী বাম-সেকুলার গোষ্ঠী নিজেদের মুখ আয়নায় কবে দেখবেন? যদি দেখেন তবে চোখে পড়বে তাদের মুখোশ বহু জায়গায় ফেটে গিয়েছে এবং মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সাম্প্রদায়িক, সংকুচিত, কট্টর, অসুহিষ্ণু চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। মানুষ এসব দেখছে এবং এজন্য এদের পরিত্যাগও করছে।

প্রণববাবুর সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে আসার কথায় অগণতান্ত্রিক ভাবে বিরোধিতা শুরু হওয়ার কারণে দেশে ও বিদেশের সমস্ত চ্যানেলে এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। যার জন্য সঙ্ঘকে শুধু জানা নয়, প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ সবার হয়েছে। এজন্য যারা বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। ১ থেকে ৬ জুন সঙ্ঘের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন গড়ে ৩৭৮ রিকোয়েস্ট আসে। ৭ জুন অনুষ্ঠানের দিন এই রিকোয়েস্ট বেড়ে হয় ১৭৭৯। এরজন্যও সবাইকে ধন্যবাদ।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

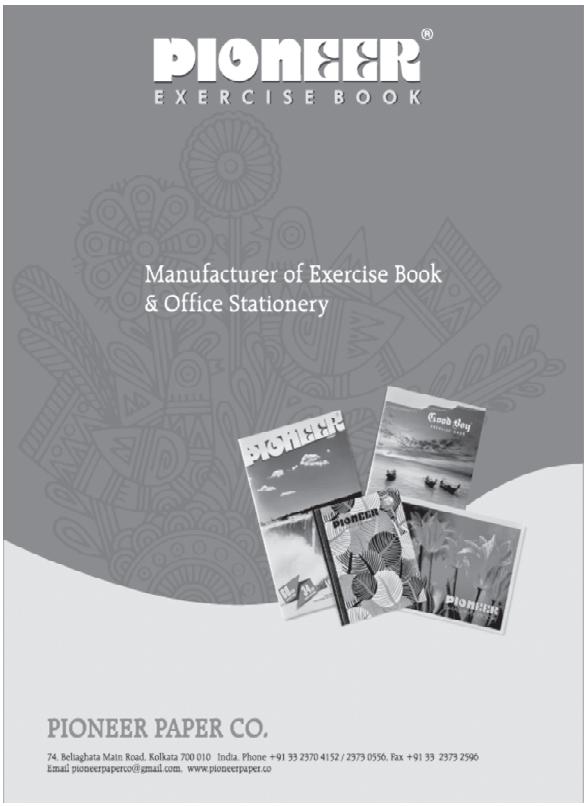

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

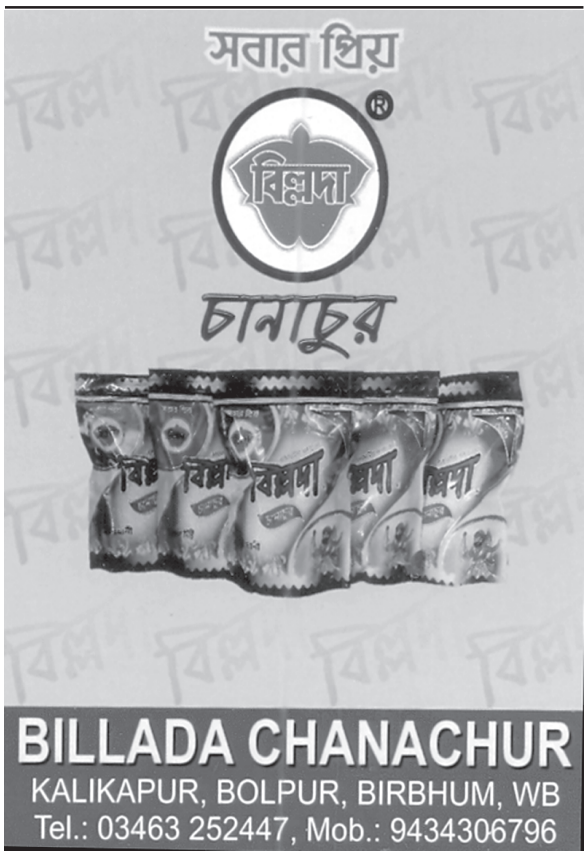

উত্তর সম্পাদকীয়

হিন্দু বাঙালি ও ড. শ্যামাপ্রসাদ

প্রবল সংগ্রাম করে জিন্নার থাবা থেকে বাঙালি হিন্দুদের জন্য বাংলার যে হিন্দু-অধ্যুষিত অংশটি ছিনিয়ে নিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ, আজ সেই ভূখণ্ডটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। ড. শ্যামাপ্রসাদ যদি এই কাজ না করতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিদের কী অবস্থা হতো তা বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দুদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

বিজয় আঢ্য

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চার অবকাশ আছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বাঙালি হিন্দুদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতির পূজারি শ্যামাপ্রসাদ একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিন্তা উদ্রেককারী বাগ্মী, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, আপোশহীন সংগ্রামী, পীড়িত, মানুষের বন্ধু এক দরদি মনের মানুষ। সর্বোপরি কোটি কোটি হিন্দু বাঙালির রক্ষাকর্তা। অথচ আমরা হিন্দু বাঙালিরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে তাঁর নাম প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। একটু রূঢ় ভাষায় বললে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লোভে তাঁকে শুধু ভোলা নয়, ভুলিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করছি। এইরকম আরও কিছু কারণেই বোধ হয় নীরদ সি চৌধুরী বলেছেন, আত্মঘাতী বাঙালি। এই বাঙালিকে যদি হিন্দু বাঙালি বলতে চাই, তাহলে তা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। যাদের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু কালচার-এ ইসলাম, তারা আর যাই হোক আত্মঘাতী নয়। তাদের অভিধানে আত্মঘাতী বলে কোনও শব্দ নেই। যদি আত্মঘাতী শব্দটি বাঙালির আগে ব্যবহার করতেই হয়, তবে তা হিন্দু বাঙালির বিশেষণ হিসেবেই যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪৫) পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সত্তর বছরের এই কালখণ্ডে হিন্দু বাঙালির বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিচারে যে মানুষটির নাম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তাঁর নাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬.৭.১৯০১– ২৩.৬.১৯৫৩)। তৎকালীন যুগপরিবেশ, বংশগৌরব, পারিবারিক আবহ, তাঁর মানস গঠন— এই সবগুলিই তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণে যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শিক্ষাবিদ পিতার পুত্র হিসেবে তিনি নিজেও শিক্ষাক্ষেত্রে একজন অগ্রণী পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইবেন, এটা স্বাভাবিক এবং হয়েছিলেনও তাই। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩২–১৯৩৮) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এত কম বয়সে এই গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী ক'জনই বা হতে পারে! মনীষী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন— ''ইউনিভার্সিটির কাজে তুমি দেখি বাপকা ব্যাটা হইয়াছ।''

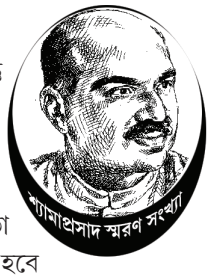

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ তুলে ধরার জন্য ১৯২৯ সালে 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটস কনস্টিটিউয়েন্সি' থেকে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদের তখনও পর্যন্ত খুব একটা আগ্রহ ছিল বলে জানা যায় না। যদিও তাঁর শৈশবকাল থেকে ওই সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে ঘটে যাচ্ছিল একের পর এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা।

বনগাঁয় তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান সীমান্ত পোস্ট পরিদর্শনে শ্যামাপ্রসাদ, সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি (১৯৫০)

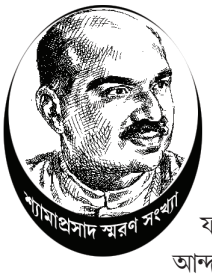

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৮-এ বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কারাবাস ও ক্ষুদিরামের ফাঁসি, ১৯১১ সালে বীর সাভারকরের আন্দামানের সেলুলার জেলে দ্বীপান্তর, ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন (১৯২২-২৩), ১৯২০-১৯২৫ সালের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা, ডান্ডিযাত্রা বা লবণ সত্যাগ্রহ (১২ মার্চ, ১৯৩০), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮.৪.১৯৩০), রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আক্রমণ (৮.১২.১৯৩০), ব্রিটিশ সরকারের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড ১৯৩২ এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫) জারি, 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'-র নিয়ম মেনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬০ শতাংশ) বাংলায় মুসলমানদের নেতৃত্বে সরকার গঠন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের পরোক্ষ সমর্থনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ভাবে হিন্দু নির্যাতন শুরু হলো। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা, মন্দির অপবিত্র করা, হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানির মাধ্যমে হিন্দুদের মনোবল একেবারে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হলো। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সদস্য হিসেবে সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধি হলো— কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ রাজনীতি হিন্দুদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাহলে ভারতবর্ষে হিন্দুদের স্বার্থ কে দেখবে— এই চিন্তা শ্যামাপ্রসাদকে ভাবিয়ে তুলল। দেশভাগের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও হিন্দুরা নির্যাতিত, বিশেষত বাঙালি হিন্দুদের স্বার্থ উপেক্ষিত। বীর সাভারকরের সঙ্গে একান্ত আলাপ-আলোচনার পর তিনি হিন্দুমহাসভায় যোগ দান করলেন, এক বছর পর ওই দলের তিনি সভাপতিও হলেন (১৯৪০)। আর এই বছরই মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' (Two nation Theory) ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামিক দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হলো। কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিল— ''The Pakisthan is a just, progressive and national demand.''

'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ধৃত গান্ধী-সহ কংগ্রেস নেতারা ১৯৪৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। এই সময় কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এক চিঠিতে মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে এমন একটি সমাধান সূত্র প্রস্তাবাকারে রাখলেন যা মুসলিম লিগের 'পাকিস্তান' প্রস্তাব মেনে নেওয়ার শামিল। এই খবরে ড. শ্যামাপ্রসাদ খুব বিচলিত হলেন। তিনি গান্ধীজীকে একটি চিঠিতে (১৯.০৭.১৯৪৪) বারবার অনুরোধ করেন তিনি যেন কিছুতেই জিন্নার ভারত ভাগের প্রস্তাব মেনে না নেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর এই দুশ্চিন্তার কথা লিখে জানিয়েছিলেন— ''This is a matter of deep regret that the Hindu point of view in Indian Politics has been systematically ignored.''

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শক্তির বদলে আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই নতুন শক্তির উদয় হলো। এই দুই শক্তি ব্রিটিশকে শক্তিহীন করতে ভারতে ও অন্যত্র ব্রিটিশ কলোনিগুলি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য কৌশলী চাপ সৃষ্টি করল। এইরকম আরও কয়েকটি কারণে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করলেন ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মুসলিম লিগ ঘোষণা করেছিল তাদের 'পাকিস্তান'-এর দাবি মেনে না নিলে ১৬ আগস্ট (১৯৪৬) থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করবে। কংগ্রেস নেতারা নাকি বুঝতে পারেননি লিগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে কী বোঝাচ্ছে। ওইদিন সকালে কলকাতায় শহিদ মিনার (অকটরলনি মনুমেন্ট) ময়দানে নমাজের পর এক বিশাল সমাবেশে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি-সহ লিগ নেতারা উত্তেজক ভাষণ দিলেন। এর পরই লিগের সদস্যরা পূর্ব পরিকল্পনা মতো তিন দিন ধরে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও হিন্দু হত্যা চালিয়ে গেল। এই হামলায় প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত, ১৫ হাজারের মতো আহত, শত শত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং হাজার হাজার নারীর ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিতে এই ঘটনার জন্য সুরাবর্দি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— ''...I will certainly hold responsible Mr. Swhrawardy Chief Minister...'' কিন্তু নেহরু-গান্ধীর কাছে বিষয়টা ছিল ''a few persons misbehave as in Calcutta' (The Statesman dtd. 19.8.46). কংগ্রেসের এই মনোভাবেরই সুযোগ নিয়ে লিগ ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে আক্রমণ শুরু করল। নোয়াখালিতে তখন ১৮ শতাংশ হিন্দু আর ৮২ শতাংশ মুসলমান, ফলে এখানেও কলকাতারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। এগারো দিন ধরে চলেছিল সেই পৈশাচিক কাণ্ড।

১৯৪৬ সালের এপ্রিলের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বাংলায় সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়েছিল। আর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নানাদিক থেকে চাপের কারণে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এদেশের মানুষের ধারণা হলো যে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই দেশের স্বাধীনতা আসতে চলেছে এবং ১৯৪৬-এর নির্বাচনে হিন্দুরা তাই কংগ্রেসকে ঢেলে ভোট দিয়েছিল। কংগ্রেসের এই তুমুল জনপ্রিয়তার কাছে ড. শ্যামাপ্রসাদের হিন্দুমহাসভা দাঁড়াতে পারেনি। তবুও তাঁর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে পূর্ববঙ্গের হামলা-পীড়িতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নোয়াখালি ছুটে গিয়েছিলেন এবং হিন্দুমহাসভার পক্ষ থেকে তাদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দিলেন। আর এখানে তিনি যে আর একটি কাজ করলেন, তাহলো সমাজ সংস্কারকের। যে বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল, বিশেষত ত্রিপুরাতে,

তিনি তাদের সসম্মানে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার কাজটি করেছিলেন।

মুসলমান জিহাদিদের এই ভয়াবহ রূপ দেখে কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এমনিতেই তাদের বয়স হয়ে গেছে, আর ব্রিটিশরাও যখন পরিস্থিতির চাপে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়, তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তগত করা দরকার। এরপর যদি আবার সুভাষচন্দ্র বসু এসে উপস্থিত হন, বিশেষত আজাদ হিন্দ ফৌজ (আই এন এ)-এর জনপ্রিয়তা যেখানে বাড়ছে, তাহলে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে কিনা সেটাও এক বড় প্রশ্ন। তাই বাঙালি হিন্দুর রক্তের বিনিময়ে ভারত ভাগের সিদ্ধান্তকে তারা মেনে নিলেন। ভারত ভূখণ্ডের ভাগাভাগি নিয়ে দর কষাকষি শুরু হলো। অবিভক্ত বাংলায় যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলিম লিগ শাসন ক্ষমতায়, তাই জিন্না অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন, চাইলেন পঞ্জাবকেও। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে অবিভক্ত বাংলার ৪৪ শতাংশ হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ও পঞ্জাবকে বিভক্ত করে হিন্দু ও শিখ-অধ্যুষিত এলাকাগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি জানালেন। বললেন, এটা না করে ভারত ভাগ করা যাবে না। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলা জুড়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুললেন। শ্যামাপ্রসাদের এই আন্দোলনকে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী, ভাষতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. যদুনাথ সরকার, প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ড. মেঘনাদ সাহা, ঈশ্বরদাস জালান প্রমুখ তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা সমর্থন জানিয়েছিলেন। বহু কংগ্রেস নেতা এবং সমর্থকরাও তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে সর্বভারতীয় কংগ্রেসও ড. শ্যামাপ্রসাদের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারল না। কিন্তু কথায় আছে, 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। এইসময় (এপ্রিল, ১৯৪৭) সুরাবর্দি এক চাল চাললেন। তিনি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গড়ার ডাক দিলেন। তাঁর এই ডাকে কংগ্রেসের একাংশ 'যাঁরা খাদি কংগ্রেস' বলে পরিচিত, তারা সুরাবর্দির এই টোপ গিললেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক চিঠিতে সতর্ক করে দিলে খাদি কংগ্রেসিরা বেশি এগোয়নি। জিন্না ও সুরাবর্দির দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং একই সঙ্গে বাংলা ও পঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে যদি ওই দুই প্রদেশের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তা স্বীকার করে। অ্যাটলির প্রস্তাব মতো ১৯৪৭-এর ২০ জুন বাংলার অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটি হয় এবং বেশিরভাগ সদস্য (৫৮-২১ ভোটে) বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দেন। একইভাবে পঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। প্রবল সংগ্রাম করে জিন্নার থাবা থেকে বাঙালি হিন্দুদের জন্য বাংলার যে হিন্দু-অধ্যুষিত অংশটি ছিনিয়ে নিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ, আজ সেই ভূখণ্ডটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। ড. শ্যামাপ্রসাদ যদি এই কাজ না করতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিদের কী অবস্থা হতো তা বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দুদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে; বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা কী নিমকহারাম যে শ্যামাপ্রসাদকে একেবারে ভুলে গেলাম। তাঁর নামটাও নবীন প্রজন্মের অনেকে জানে না। এই আত্মঘাতী নীতির এখনই সংশোধন না করলে আমাদের যে কী মাশুল দিতে হতে পারে তার অশনি সংকেত এখনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আবার শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পাশের রাজ্য অসমেও হিন্দু বাঙালিরা এখন বিপর্যয়ের মুখোমুখি। চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস্) থেকে যেসব হিন্দু বাঙালির নাম বাদ পড়বে, তাদের পরিণাম কী হবে? বস্তুত এই প্রশ্ন ইতিহাসেরও। সত্তর বছর আগে ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদের দেশভাগ হিন্দু বাঙালিকে এক অনিঃশেষ বিপর্যয়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমানরা শেষমেষ একটি নিজস্ব দেশ পেয়েছে, বাংলাদেশে তাঁরা নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণ করতে পারেন, মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন। কিন্তু হিন্দু বাঙালি সত্তর বছর পরও অসমে এক ভাসমান ভাষাগত (ভাষিক) সমাজ। ২০১৬ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য জোড়া নোটিফিকেশন এনেছিল কেন্দ্রের মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনওটিই ফলদায়ক হয়নি। দেশভাগ করে যে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, তা ছিল এক ভয়ঙ্কর ভুল। হিন্দু বাঙালিকে এর খেসারত দিতে হচ্ছে সত্তর বছর ধরে। স্মরণ রাখতে হবে, শুধু হিন্দু বাঙালি নয়, বিশ্বের সকল হিন্দুর আশ্রয়দাতা এই ভারতবর্ষ। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই অপকর্ম রুখতেই আজীবন আপোশহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে কারারুদ্ধ অবস্থায় আত্মবলিদান করেছেন। আমরা কি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ড. শ্যামাপ্রসাদকে যে ভুলিনি, তা প্রমাণ করতে পারব? শুধু মিটিং, মিছিল, সেমিনার, লেখালিখি, বিতর্ক, সোশ্যাল মিডিয়া— এই সব তো আছেই, কিন্তু এইসব প্রতিবাদের ভাষাকে যতক্ষণ প্রতিরোধে রূপান্তরিত করা না যাচ্ছে, যেমন সংগঠিত ভাবে পথে নেমে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারে স্বৈরাচারী শাসকদের বাধ্য করা হয়েছিল, যেখানে ছিল ঘামের গন্ধ, ততক্ষণ শুধু প্রতিবাদে কোনও কাজ হবে না। শ্যামাপ্রসাদও এটা জানতেন। তাই সংসদে প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, অখণ্ড ভারতের পূজারি শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার্থে যা জাতীয় স্বার্থেরই নামান্তর তার জন্য আত্মবলিদান পর্যন্ত দিয়েছেন। নিজের জীবনের মূল্যে প্রতিরোধের ভাষা কেমন হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা কি সত্যিই সেই পথের পথিক হতে প্রস্তুত?

■

Sun Oil Co. (P) Ltd.

AN ISO 9001:2000 COMPANY

Manufacturers of :

LUBRICATING OILS, GREASES AND SPECIALITY PRODUCTS

Sun Oil Company enjoy OEM approvals of :

Greaves Ltd., Simpson & Co. Ltd., Eicher Motors, Swaraj Mazda, Hindustan Motors, Punjab Tractors Ltd., H.M.T. Tractors, Kirloskar Oil Engines Ltd. Jasso Japan.

Address :
10-B, British Indian Street
Kolkata - 700 069
Telephone : 22436192, 22437935 &
22488813, Fax : 91-33-22480850
E-mail : sunoil@cal3.vsnl.net.in

With Best Wishes from :

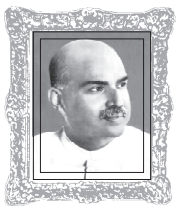

" The Country Owes an unlimited gratitude to Dr. Shyamaprasad Mukherjee for his Sacrifices for Kashmir."

সৌজন্যে :
পীযুষ কানোরিয়া

With Best Compliments from :

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

"DIMPLE COURT"
1ST FLOOR,
28, SHAKESPEARE SARANI
KOLKATA - 700 017

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান

প্রণব দত্ত মজুমদার

গত মার্চ মাসে বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় বাম জমানার অবসান ঘটে এবং বিপুলভাবে জয়ী হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসে। ওই সময় কিছু অতি উৎসাহী লোক (তারা বিজেপির লোক কিনা কেউ জানে না) একটি জবরদখল করা জমিতে বসানো লেনিনের মূর্তি অপসারিত করে। ব্যাস, বদলার রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিবাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা বদলা হিসাবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে স্থাপিত ড. শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে আলকাতরা মাখায় এবং ছেনি হাতুড়ি দিয়ে মূর্তিকে বিকৃত করার চেষ্টা করে। ওই ছাত্ররা কাজটি করার পরে বুক ফুলিয়ে এমন আস্ফালন করতে থাকে যেন দেশ ও দশের জন্য বিরাট কিছু করে ফেলেছে।

এরা কী ধরনের ছাত্র, এদের বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতাই বা কী, এদের মা-বাবাদের শিক্ষাদীক্ষাই বা কোন স্তরের তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। কারণ প্রকৃত শিক্ষিত-মার্জিত-রুচিশীল মা-বাবার শিক্ষায় এরূপ কদর্য রুচির সন্তান সম্ভব নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, তারা মুখে যেসব বড় বড় তত্ত্ব আদর্শের কথা বলে তা বাস্তবে রূপ দিতে গেলে মানবতার যে স্তরে পৌঁছুতে হবে, সেই স্তরে পৌঁছবার প্রয়াস কি তাদের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে? এরা ভাবে নেতাদের শেখানো দু' চারটি বড় বড় রাজনৈতিক ডায়লগ দিলেই বিরাট কেউকেটা হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ওই ছাত্ররা এবং তাদের মা বাবারা দয়া করে জেনে নিন— তাঁদের ছেলে মেয়েরা যে বয়সে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করতে থাকবে অথবা ঝান্ডা নিয়ে ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতাদের পেছন পেছন ঘুরতে থাকবে, সেই বয়সেই ড. শ্যামাপ্রসাদ স্বীয় পাণ্ডিত্যে ও কর্মদক্ষতায় কোন স্তরে পৌঁছেছিলেন এবং তখনকার দিনে ভারতবিখ্যাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কী সব যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন! তার ফল হয়তো তাদের বাপ-ঠাকুরদারা পেয়ে থাকবেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা তো এখানে বাদই দিলাম।

পিতা-মাতা থেকেই সন্তানের মধ্যে নানাবিধ মানবিক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের বীজ প্রবাহিত হয়— বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে ডি.এন.এ বলে। ড. শ্যামাপ্রসাদের ডি.এন.এ-র রূপটি বুঝবার জন্য তাঁর পিতা-মাতার কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্যামাপ্রসাদের মাতা যোগমায়া দেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা একজন মহিলা। পিতা ছিলেন মহাজ্ঞানী বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁর সমসাময়িক বিদ্বজ্জনেরা আশুতোষকে মা সরস্বতীর বরপুত্র বলে গণ্য করতেন। তাঁর অর্জিত ডিগ্রিগুলি তাঁর নামের পাশে লিখলে এইরকম দাঁড়ায়— স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়— Knight, MA, PRS, DL, DSc, CIE, CSI, FRAS, FRSE, Saraswati, Shastravachaspati, Sambudhagam– Chakravarty. ব্রিটিশ পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েও তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কাজ করে গেছেন, ইংরেজের অঙ্গুলি হেলনে মাথা নত করে কাজ করেননি বলেই তখনকার বাঙালি সমাজ তাঁকে বাংলার বাঘ বলতো। এহেন ব্যক্তির ছেলে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি ছিলেন বাপকা বেটা!

১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ। পিতার মতোই মেধাবী ছিলেন তিনি। তিনি ম্যাট্রিক, আই.এ, বি.এ (ইংলিশ অনার্স), এম.এ, বি.এল, সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে পিতার মৃত্যুর পরপরই শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ২৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হয়ে যান। ১৯২৫ সালে তিনি ইংলন্ডে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত আইনি প্রতিষ্ঠান 'লিঙ্কন্স্ ইন' থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন ১৯২৭ সালে।

মাত্র ২৩ বছর বয়সেই ড. শ্যামাপ্রসাদ তখনকার দিনের বিখ্যাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত পর পর দুটো টার্ম

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মিটিংয়ে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। (১৯৪৯)

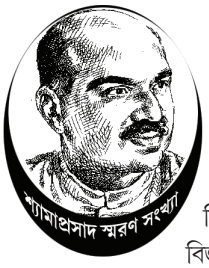

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন তিনি ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩। ভাবা যায়। তখন এদেশের বিখ্যাত জ্ঞানীগুণীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। সেই সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর পিতা আশুতোষের কাছ থেকে এক্সটেনশন পেয়ে ৬২ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই বিজ্ঞানীর অধ্যাপনার মেয়াদ ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আচার্য রায় অবশ্য এই এক্সটেনশনের জন্য কোনও টাকাপয়সা নেননি। মহানন্দে ছাত্রদের বিদ্যা বিতরণ করে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শ্যামাপ্রসাদের কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্যামাপ্রসাদকে লিখেছিলেন— ''বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তুমি দেখি বাপকা ব্যাটা হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজি নয়''।

ড. শ্যামাপ্রসাদের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শল্য চিকিৎসক, ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের মেডিক্যাল অফিসার ড. হাসান সুরাবর্দি। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না; তবুও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে উপাচার্য নিযুক্ত করে মুসলমানদের একটু তোল্লা দেওয়ার জন্য। শ্যামাপ্রসাদ যেহেতু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের একজন দক্ষ সদস্য ছিলেন, ড. হাসান সবসময় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ চালাতেন। পরে ১৯৩৪ সালে, ড. শ্যামাপ্রসাদ যখন ড. হাসানের কাছ থেকে উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন ড. হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মিটিংয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— ''Nobody knows more than I personally do, fo great help, that as Vice-Chancellor I got from you and the great difficulty I would have been in without your co-operation. Your hard work, your arduous labour in connection with the reorganization of the University has been well recognized and rewarded.''

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর দুটো টার্ম উপাচার্য থাকাকালীন নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সব উল্লেখযোগ্য কাজগুলো তিনি করেছিলেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো—

(১) মাতৃভাষার মাধ্যমে মেট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। (২) সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। (৩) বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। (৪) ছাত্রীদের জন্য 'হোম-সাইন্স' পাঠক্রম চালু করেছিলেন। (৫) শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য টিচার্স ট্রেনিং কোর্স চালু করেছিলেন। (৬) ছাত্রদের জন্য 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' কোর্স চালু করেন। পরে এর সঙ্গে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম চালু হয়। (৭) বিজ্ঞান শাখায় আই.এসসি কোর্স চালু করেন। (৮) ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে 'কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং' কোর্স চালু করেন। (৯) মেট্রিকুলেশন থেকে এমএ পর্যন্ত ভূগোল পড়ার ব্যবস্থা করেন। (১০) এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন।(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক হিস্টরি অ্যান্ড কালচার' বিভাগ চালু করেন।(১২) বিশ্ববিদ্যালয়ে চৈনিক ও তিব্বতি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করেন।(১৩) মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের সীমা তুলে দেন। (১৪) বাংলা ভাষায় পিএইচডি করার জন্য গবেষণাপত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান করেন। (১৫) ছাত্রদের কর্ম সংস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করেন 'ইনফরমেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড'। (১৬) প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'আশুতোষ মিউজিয়াম'। (১৭) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য 'ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর' ও 'মিলিটারি স্টাডিজ'-এর প্রবর্তন করেন। (১৮) ছাত্রদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 'স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার বোর্ড' গঠন করেন। (১৯) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের অবহিত করার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। (২০) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সম্প্রসারণ করেন। গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালে ফ্রেস্কো ডেকোরেশনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রম বিকাশের চিত্র তথা বাংলার অবদান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছিলেন। (২১) ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। (২২) ছাত্রদের খেলাধুলা ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকুরিয়া লেকে চালু করেছিলেন— 'ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব'। চালু করেছিলেন 'ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব'।

এই ভাবে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য যা যা পরিকাঠামো দরকার তা তিনি করে দিয়েছিলেন অসমান্য দক্ষতায় এবং এত অল্প বয়সে।

তখনকার দিনের বিচারে আর একটি কঠিন কাজ তিনি করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'বহিরাগত' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও বিশ্বকবি সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়ে বেড়ান, ড. শ্যামাপ্রসাদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে 'বহিরাগত' কবিকে সমাবর্তন ভাষণ দিতে আহ্বান জানালেন— তখন কবি বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ যদি আর একটি নিয়ম ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ বাংলায় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে কবি সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। আসলে কবির উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। ভরা ইংরেজ জমানায়, যেখানে পড়াশুনার পুরো মাধ্যমটাই ছিল ইংরেজি এবং যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, জ্ঞানীগুণী অভ্যাগতদের মধ্যে অনেক অবাংলাভাষী থাকতেন, সেখানে সমাবর্তন ভাষণ বাংলায় দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ সেই নিয়ম ভেঙে দেখিয়েছিলেন তাঁর ডিএনএ এসেছে পিতা বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে; তিনি কারোর গোলামি করতে আসেননি; বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোর জন্য যা করা দরকার তাই তিনি করবেন।

যে অর্বাচীনের দল ড. শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে আলকাতারা মাখিয়েছিল তারা এবং তাদের পিতা-মাতারা সারাজীবন চেষ্টা করলেও ড. শ্যামাপ্রসাদ ৩৩ বছর বয়সে যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন তার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারবেন কি? কথায় আছে 'অল্প জলের মাছ গভীর জলে পড়লে খুব লাফালাফি করে, তারপর নেতিয়ে পড়ে'। এদের অবস্থাও তাই। ■

ড. শ্যামাপ্রসাদের নামে শিয়ালদা স্টেশনের নাম রাখার সময় এসেছে

দেবব্রত চৌধুরী

একথা সবারই জানা ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। জওহরলাল নেহরু ভারত ভাগে বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশ দুটিকে ইসলামি পাকিস্তানকে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পঞ্জাবের অকালি দলের নেতা মাস্টার তারা সিংহ ও শার্দুল সিংহ। ড. শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে জানালেন, ''তিনি কিছুতেই পুরো বাংলাকে পাকিস্তানে দিতে দেবেন না''। জওহরলাল ওই চিঠির জবাবে লিখেছিলেন— বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু, এই প্রদেশে মুসলমান ৫৪ শতাংশ আর হিন্দু ৪৪ শতাংশ অর্থাৎ হিন্দুরা সংখ্যায় কম তাই এই প্রদেশটি পাকিস্তানে যাবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ তীব্র ভাষায় লিখলেন যে, 'আপনি মাত্র ২৫ শতাংশ মুসলমানের ইচ্ছাকে সম্মান করে ভারতমাতার ৩০ শতাংশ জমি দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করছেন। আর বাংলার ৪৪ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কথা ভাবছেন না। আমরা বাঙালিরা কোনও ভাবেই পুরো বাংলাদেশ দিতে দেব না। বাংলা ভাগ করে হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তৈরি করতে হবে।' পঞ্জাবে তারা সিংহ এই রকম দাবি করেছিলেন। অবশেষে জওহরলাল নেহরু বাংলাকে ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ করতে বাধ্য হন। ড. শ্যামাপ্রসাদ সগর্বে ঘোষণা করলেন— ''কংগ্রেস ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করল। আমি সেই পাকিস্তান ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি করলাম।''

পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পর শ্যামাপ্রসাদ দুইবঙ্গের ধর্মভিত্তিক লোক বিনিময় করতে বললেন। অবিভক্ত বাংলার প্রায় ২০ শতাংশ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদের লোক বিনিময়ের দাবি মানলেন না। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ববাংলার) প্রায় ৩০ শতাংশ জনসংখ্যা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। লোক বিনিময় মেনে নিলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বাড়তো না। কিন্তু পাকিস্তান আমলে সরকারি সমর্থনে সৃষ্টি হওয়া 'রাজাকার বাহিনী' হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর পাশবিক অত্যাচার শুরু করল। শুরু করল হিন্দু মহিলা ধর্ষণ, হিন্দুদের জোর করে ধর্ম পরিবর্তন, হিন্দু নারীদের জোর করে বিবাহ, হিন্দুদের জমি ও বাড়ি দখল ও হত্যা যাতে স্থানীয় হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে চলে যায় বা যেতে বাধ্য হয়। হিসাবমতো ১৯৪৭-৫১ এই সময়ে প্রায় ১.৭৫ কোটি হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। এই বিরাট জনসমুদ্রের বৃহদংশ শিয়ালদহ স্টেশন ক্যাম্পাসে ও পাশের খোলা জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে সত্বর পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কথা বলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি বাস্তুহারাদের সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করেন। কথামতো জওহরলাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ লিয়াকত আলির সঙ্গে বসে এক চুক্তি করেন যা 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি বলে বিখ্যাত। এই চুক্তির মতে কোনও লোক বিনা পাশপোর্টে আর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারবে না। এই চুক্তি হিন্দুদের কাছে ভয়ঙ্কর। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তির বিরোধিতা করেন। প্রতিবাদ স্বরূপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে বাস্তুহারাদের যথাযথ সেবা করার জন্য কলকাতায় চলে আসেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা সেবক সমিতি নামে এক সংগঠন তৈরি করেন। অজস্র হিন্দু নেতা-যুবক এই সমিতিতে যোগদান করেন। বাস্তুহারাদের মূলত শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা এবং স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমিতির মাধ্যমে। বাঙালির কাছে শ্যামাপ্রসাদ হয়ে উঠলেন একমাত্র হিন্দু বাঙালির রক্ষক। কারণ কংগ্রেস সরকার এ ব্যাপারে বাঙালি হিন্দু বাস্তুহারাদের কোনওরকম সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বাস্তুহারারা হয়ে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদ প্রেমিক।

শ্যামাপ্রসাদের জনসমর্থনে অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও হয়ে উঠল শঙ্কিত। তারা শুরু করল শ্যামাপ্রসাদ বিরোধিতা। বাঙালির দুর্ভাগ্য, ১৯৫৩ সালে ২৩ জুন কাশ্মীরে বন্দি অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ৫২ বছরে মৃত্যুবরণ করেন। সঠিক তদন্ত আজও হয়নি। কংগ্রেস- বামফ্রন্ট শ্যামাপ্রসাদকে লোকমনে সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে যাতে মুসলমান ভোট তারা সহজে পেয়ে যেতে পারে। মাত্র ২ মাস আগে শ্যামাপ্রসাদের দাহস্থান কেওড়াতলায় কিছু অতি বাম যুবক শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভেঙে মূর্তির উপর আলকাতারা ঢেলে দেয়। অবাক লাগে মাত্র ১ মিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন।

আসলে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট সব দলগুলিই ড. শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে যাতে মুসলমান সম্প্রদায় খুশি হয়। জিন্নার সবচেয়ে পছন্দের শহর কলকাতা পাকিস্তানে নেওয়া সম্ভব হয়নি ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতিবাদের কারণে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বিশেষ করে যাদের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে ছিলেন তারা কিন্তু মনে প্রাণে এখনও শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা করেন। তাই যদি মোদী সরকার ২০১৮-র মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনটি নাম পাল্টে 'শ্যামাপ্রসাদ স্টেশন' করেন তবে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় ২০১৯-এ নরেন্দ্র মোদী বাঙালি সমাজের বিপুল সমর্থন পাবেন। এই সমর্থন আরও বাড়বে যদি ভারতের কনিষ্ঠতম শহিদ ক্ষুদিরামের নামে খড়্গপুর স্টেশনটির নাম রাখা যায়। কারণ ক্ষুদিরাম ছিলেন মেদিনীপুরের সন্তান।

With Best Compliments
from :-

Rajnesh Kumar Malhotra

A Historical Journey Since 1940

GODAVARI COMMODITIES LTD.

(Bhutoria Group of Company)

SINGLE SOLUTION ORGANISATION ON COAL

Business Interests :

Coal Handling * Trading of Coal * Mine Outsourcing * Mining of Coal * Consultancy of Coal Mining * Real Estate * Finance

18, N. S. Road, 2nd Floor, Kolkata- 700 001
Phone : +91-33-2242 6134/8972
Fax : +91-33-2242 6160
Email : imbgodavari2@gmail.com

Assansol, Durgapur, Andal, Ranigunj, Dhanbad, Ranchi, Ramgarh, Khelari, Singroli, Korba, Nagpur, Brijrajnagar, Talchar

বিশেষ প্রতিবেদন

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যাত্রাপালা

দীপক কুমার ঘোষ

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর তিন মন্ত্রীকে নিয়ে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজলের সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ঘরে দামি সোফায় শুয়ে ৮ দিন অনশন ধরনায় বসে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় কলকাতার এসপ্ল্যানেডে মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধরনামঞ্চে মমতা ব্যানার্জি কীভাবে দিনে বালিশের তলায় রাখা চকোলেট ও রাতে চিকেন স্যান্ডউইচ্ খেয়ে ২৬ দিন 'অনশন' করেছিলেন, তাঁর বিবরণ আমার 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি' বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে (পৃ. ৯৮-১০২) বিস্তারিত লিখেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেননি, কলকাতা হাইকোর্টে দেড় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানহানির মামলা করেছিলেন বটে, তবে সে মামলা তড়িঘড়ি প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন--- জানতেন, আমার অভিযোগ 'অসত্য' প্রমাণ করতে পারবেন না।

অরবিন্দ লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার মতো কোনও মিথ্যা দাবি কখনো করেননি। তিনি কেন এই অনশনের নাটক করলেন তা বিশদে লিখবার আগে কর্মজীবনের প্রথমে তিনি কীরকম 'উপর দিকে থুতু ফেলবার' চেষ্টা করে সহকর্মীদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছিলেন সে কথা জেনে রাখা ভালো।

খড়্গপুর আই. আই. টি.-র ছাত্র অরবিন্দ আই.এ.এস. হবার ইচ্ছায় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মূল পরীক্ষায় পাশ করে আই এ এস বা আই এফ (ফরেন) এস-এ নির্বাচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তাই আই আর এস (ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস)-এ সুযোগ পেয়ে ১৯৯৫ সালে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হয়েছিলেন। ৮ বছর পর ২০০৩ সালে প্রমোশন পেয়ে দপ্তরের জয়েন্ট কমিশনার হয়ে

দিল্লি থেকে চণ্ডিগড় বদলি হয়ে যান। কিন্তু চণ্ডিগড়ে কাজে যোগ না দিয়ে তিনি ২০০৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০০৫ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২ বছরের বিশেষ ছুটি নেন। তারপর ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকুরি ছেড়ে দেন। সর্বনিম্ন ২০ বছর চাকুরি না করবার জন্য তিনি কোনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি পাননি। অবশ্য তাঁর সংসার খরচের জন্য ভাবতে হয়নি, কেননা তাঁর স্ত্রী সুনীতাও একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছিলেন। তাঁর রোজগারেই সংসার চলতো। অরবিন্দ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাঁর স্ত্রীও চাকুরি ছেড়ে দেন। তিনিও অবশ্য ২০ বছর কাজ করেননি, তাই পেনশন পান না। অরবিন্দ মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে, চাকুরি ছেড়ে দেবার সময় তিনি ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার।

২০১৩ সালের ২৩ নভেম্বর ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতি দিয়ে অরবিন্দের এই মিথ্যা দাবি খারিজ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ শিবপুরী ২ পৃষ্ঠার এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'আই আর এস অ্যাসোসিয়েশন বিগত কিছুদিন যাবৎ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নানা বিবৃতিতে ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের আধিকারিকদের দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলে বলেছেন যে, ইচ্ছে করলে তিনি অসদুপায়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারতেন। তিনি কি ভুলে গেলেন যে, তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল এখনও ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরেই কাজ করছেন? অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা এসব মিথ্যা উক্তি সব ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকেই কালিমালিপ্ত করছে। তাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এসব মিথ্যা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকুন, নাইলে অ্যাসোসিয়েশন আপনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে।'' ওই অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রকাশ্য বিবৃতির পর অরবিন্দ অবশ্য আর কখনও উপর দিকে থুথু ফেলেননি।

২০০০ সালের নভেম্বর থেকে ২০০২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ বছরের 'পড়াশোনার জন্য ছুটি' নিয়েছিলেন অরবিন্দ। সরকারি নিয়ম অনুসারে শর্ত ছিল— ছুটি থেকে ফিরে অন্তত ৩ বছর তিনি সরকারি কাজ করবেন। তা না করে তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আন্না হাজারের আন্দোলনে প্রকাশ্যে অংশ নিলে, সরকার তাঁর কাছে সরকারের পাওনা ৯.২৭ লক্ষ টাকা দাবি করে। অরবিন্দ প্রথমে দাবি করেন যে, তিন বছর পর সরকার টাকা চাইছে, তাই তিনি টাকা দেবেন না। অবশেষে তাঁর বোধোদয় হলে, তিনি বন্ধুদের থেকে টাকা ধার নিয়ে সরকারি পাওনা মিটিয়ে দিলে সরকার তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে। এই হচ্ছে তাঁর সরকারি উচ্চপদে কাজের নমুনা।

আন্না হাজারে যখন তাঁর দিল্লির ধরনা প্রত্যাহার করে মহারাষ্ট্রের নিজের গ্রামে ফিরে যান, তখন অভিভাবকহীন অরবিন্দ সুপ্রিম কোর্টের নামজাদা অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ভূষণ ও অন্য কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মীকে নিয়ে আম আদমি পার্টি বা 'আপ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। প্রথম প্রথম দিল্লি, পঞ্জাব, গুজরাট-সহ কয়েকটি রাজ্যে আপ সৎ, শিক্ষিত সমাজকর্মীদের পার্টি হিসাবে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আপ দিল্লির ৭টি

ফঃ ৩

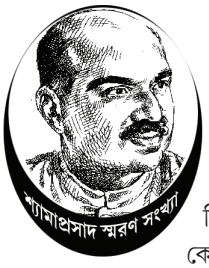

লোকসভা আসনের মধ্যে ৫টিতে জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল সেবার জাতীয় কংগ্রেস দিল্লিতে একটি আসনও পায়নি, বিজেপি পেয়েছিল বাকি ২টি আসন। পরে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনেও আপ বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে জয়লাভ করে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৭ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করে নিজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নানা দাবি তুলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দাবিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল দিল্লির পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা এবং দিল্লি পুলিশের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিল্লি চণ্ডীগড় বা পণ্ডিচেরীর মতো শহর নয়, দিল্লি জাতীয় রাজধানী। তিনি এও ভুলে গিয়েছিলেন যে, রাজ্যে ক্ষমতা পেলেও আপ দিল্লির ২টি পৌরসভার নির্বাচনে একটিতেও জয়লাভ করতে পারেনি, দুটিতেই ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি।

ইতিমধ্যে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বিদেশি অর্থ সংগ্রহ, বিশেষ করে কানাডার খালিস্তানিদের থেকে অর্থ সংগ্রহ নিয়ে আপের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠতে শুরু করলে প্রশান্ত ভূষণ ও আরও কয়েকজন আপ নেতা দল ছেড়ে দেন। তাঁরা কেজরিওয়ালের স্বেচ্ছাচারিতারও অনেক তথ্য সামনে নিয়ে আসেন। দলে ভাঙন শুরু হয়। অন্তত ৪ জন বিধায়ক দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁদের মধ্যে কপিল মিশ্র অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও মণীশ শিশোদিয়ার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তুলে ধরেছেন।

কেজরিওয়াল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু মন্তব্য করলে, অরুণ জেটলি আদালতের দ্বারস্থ হন। বিপদ বুঝে কেজরিওয়াল নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। এরকম আরও অনেক অবিবেচকের মতো কাজ করেই কেজরিওয়াল ফেঁসে গেছেন।

প্রায় ৪ মাস আগে দিল্লি সরকারের মুখ্যসচিব অংশু প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এক সরকারি মিটিংয়ে গিয়ে শুধু অপমানিতই হননি, কতিপয় আপ বিধায়ক তাঁকে শারীরিক নিগ্রহও করেন। তিনি কোনওরকমে পালিয়ে আসেন এবং বাড়িতে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাও করতে হয়।

সংবিধানের ৩১১ ধারায় সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহের আধিকারিকদের, যথা, আই এ এস, আই পি এস ইত্যাদি, সরকারের কোনো খামখেয়াল থেকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে যাতে, এসব পদাধিকারীরা রাজনৈতিক উপরওয়ালাদের কোনো ব্যক্তিগত বা দলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়। অবশ্য কোনো কোনো রাজ্যে, যেমন হালের পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রেও যেমন ১৯৭৫-৭৬ সালের জরুরি অবস্থার সময় আধিকাংশ আই এ এস, আই পি এস আধিকারিকেরা ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রীদের, এমনকী দলীয় নেতাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাও খোয়ান, আবার বে-আইনি কাজও করেন। তবে দিল্লি সরকারের আই এ এস-দের অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যসচিবের নিগ্রহের পর আপ সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে কোনো বৈঠকে উপস্থিত না থেকেও জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে রুটিন কাজ করে যেতে দৃঢ় সংকল্প করবার পর আপ সরকারের, বিশেষ করে আপ-প্রধান কেজরিওয়ালের সব জারিজুরি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ৪ মাস অচল অবস্থা চলবার পর, কেজরিওয়াল ও তাঁর মন্ত্রীরা উপরাজ্যপালের সরকারি বাসভবনের একটি ঘর দখল করে ধরনায় বসেছিলেন। তাদের দাবি ছিল, উপরাজ্যপাল যেন আই এ এস আধিকারিকদের মন্ত্রীদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য করেন। ৭ দিন অচলাবস্থা চলে। গত ১৮ জুন নীতি আয়োগের বার্ষিক বৈঠকের সময় গাঁয়ে-মানে-না- আপনি মোড়ল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজের রাজ্যে আই এ এস, আই পি এস-দের পায়ের হাওয়াই চটি বানিয়ে ফেলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন, তিনি যেন হস্তক্ষেপ করে আপ মন্ত্রীদের মান বাঁচান। প্রধানমন্ত্রী না-শোনার ভান করে এড়িয়ে গেছেন।

সেদিনই দিল্লি হাইকোর্ট এই অনশন-ধরনা নাটকের জন্য কেজরিওয়ালদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। আপ-মন্ত্রীদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে মনে করে দিল্লির উপরাজ্যপাল অনিল বৈজল অবশেষে আই এ এস-দের বুঝিয়েসুজিয়ে জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে মন্ত্রীদের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তা থেকে সরিয়ে আনতে সফল হন। আত্মগর্বী আপনেতা কেজরিওয়াল তাঁর থেকে অনেক বেশি জ্ঞানীগুণী আই এ এস আধিকারিকদের কাছে মাথা নত করে আপাতত স্বস্তি পেয়েছেন। তবে তাঁর মতো হঠাৎ রাজা এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে এবং ভুঁইফোঁড় আপ দলকে আগামী নির্বাচনে দিল্লির নাগরিকেরা সিংহাসনচ্যুত করলেই এঁদের উচিত শিক্ষা হবে। দুঃখ হয়, একদিকে প্রায় সব রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী ও অন্যদিকে হাতে গোণা কয়েকজন আই এ এস, আই পি এস অফিসার কীভাবে স্থায়ী আমলাতন্ত্র ও অস্থায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীদের মধ্যে জনস্বার্থে যে সাংবিধানিক ও আইনি সম্পর্ক ছিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে যা থাকা প্রয়োজন, তা নষ্ট করে দিচ্ছেন।

১৯৫৮ সালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কনিষ্ঠ কেরানির কাজ করবার সময়, একবার সৌভাগ্য হয়েছিল— মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের কথামতো প্রধানমন্ত্রী নেহরুর লেখা একটি চিঠি টাইপ করার। যুগ্মসচিব প্রমোশনপ্রাপ্ত আই এ এস শিশির কুমার গুপ্ত মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বিনীতভাবে সংশোধন করে দিচ্ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তা মেনে নিয়ে পরের কথাটি বলছিলেন। ১৯৬৩ সালে তমলুক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করবার সময় লক্ষ্য করতাম সেচমন্ত্রী অজয় মুখার্জি কত বিনয় সহকারে এবং সবসময় হেসে কথা বলতেন। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির গোলমালের সময় তিনি ছিলেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। তখন আমি শিলিগুড়িতে মহকুমাশাসক। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে কথা বলেছিলেন।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে মৎস্য ও সমবায় মন্ত্রী ছিলেন ভক্তিভূষণ মণ্ডল। আমি ছিলাম সমবায়ের রেজিস্ট্রার, সৈয়দ মুস্তাক মুর্শেদ ছিলেন মৎস্য দপ্তরের সচিব। একদিন দেখেছিলাম, মুর্শেদ সাহেব কীভাবে মন্ত্রীকে বলেছিলেন, ''আঙুল তুলে কথা বলবেন না। বললে আপনাকে চেয়ারসুদ্ধ তুলে জানালা দিয়ে ফেলে দেবো।'' মন্ত্রী কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। মুর্শেদ সাহেব বিদ্যুৎসচিব পদে বদলি হয়েছিলেন।

যখন দিল্লিতে যুগ্মসচিব ছিলাম, আই এ এস সচিবকে দেখেছি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সামনে কথা বলতে কীরকম কুঁকড়ে যেতেন, আবার আই এ এস নন, এমন এক সচিবকে দেখেছি, প্রধানমন্ত্রীর ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন। একটু হেসে রাজীব গান্ধী ভুল মেনে নিয়েছেন। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সেজন্য মমতা ব্যানার্জি, কেজরিওয়ালরাই বেশি দায়ী।

(লেখক প্রাক্তন আমলা)

সময় এসেছে হৃদয় দিয়ে কাশ্মীরি জনগণের মন জয় করার

মেজর জেনারেল কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অ:ব: প্রাপ্ত)

জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি-পিডিপি সরকারের পতন ঘটল। ইদ উৎসবের পরের দিনই বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স ইচ্ছে করলে পিডিপি-কে সমর্থন দিয়ে সরকার গড়তে পারত। তাহলে সরকার পড়লেও নতুন পিডিপি-এনসি-র সরকার ক্ষমতায় আসতে পারত। কিন্তু এনসি পার্টির নেতৃত্ব পিডিপি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকার গড়তে রাজি হলেন না। বরং বিজেপি-পিডিপি সরকার কাশ্মীরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে বলে ওই সরকারের সমালোচনা করলেন।

কিন্তু কেন বিজেপি সরকার থেকে ইস্তফা দিল? সে বিষয়ে কেউই পরিষ্কার ভাবে বিজেপির তরফে মুখ খুলছেন না। ছোটোখাট নেতারা বলছেন বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বিজেপি নেতৃত্বের পরামর্শ মানতে চাইছিলেন না। তিনি বলেছেন, শক্তি প্রয়োগের নীতি এখানে ফলপ্রসূ হবে না। কারণ জম্মু-কাশ্মীর অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নয়। কাশ্মীরের জনতা বুঝতে পারবেন, কীভাবে আমরা ৩৭০ ধারাকে স্পর্শ করতে দিইনি। ৩৫-এ ধারাও অপরিবর্তিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি প্রয়োগের নীতির পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে ধারা ৩৫-এ।

অনেকেই বলছেন জম্মু ও লাদাখের নাগরিকরা বুঝতেই পারছিলেন না, তাঁরাও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নাগরিক। জম্মু ও লাদাখের উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের অবজ্ঞার জন্যও তারা ক্ষুব্ধ।

এটা যে হবে তা সেই ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতার সময়ই মহারাজা হরি সিংহ অনুধাবন করেছিলেন। যখন মহারাজা ও নবাবদের বলা হলো, তাঁদের ইচ্ছেমতো ভারত অথবা কাশ্মীরে তাঁদের রাজ্য যোগদান করতে পারবে। কিন্তু কোনও রাজ্যই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে থাকতে পারবে না। মহারাজা হরি সিংহ চিন্তা করছিলেন ভারতে যোগদান করলে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষ অখুশি হতে পারেন, আবার পাকিস্তানে যোগদান করলে জম্মু ও লাদাখের মানুষ অখুশি হবেন। সেই কারণেই সনদে স্বাক্ষর করতে তিনি দেরি করছিলেন। সেই সুযোগে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। জোর করে তাঁর রাজ্য কোনও পক্ষ কেড়ে নেবে তা তিনি চাননি, তাই সনদে সাক্ষর করে ভারতে যোগদান করেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে থাকার শেষ চেষ্টা থেকে তাঁকে বিরত হতে হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যখন পাকিস্তানি বাহিনীকে জম্মু-কাশ্মীরের ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিতাড়িত করে এনেছে এবং প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য ঊরি অধিকারের জন্য কয়েকদিনের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ও প্রচণ্ড চাপের ফলে এক তরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ স্বাধীনতার প্রায় ৭০ বছর পরও অবস্থা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আজাদ-কাশ্মীর নামে পাকিস্তানের অধিকার রয়েছে। কাশ্মীরের সুফি সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ সে সময় পাকিস্তানের কদর্য রূপ দেখে ভারতের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড থেকে শরণার্থী সাজিয়ে বহু মানুষকে জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয় পাকিস্তান। তারা আজ কাশ্মীরের বিশিষ্ট নাগরিক সেজে বসে রয়েছে। পণ্ডিত সমাজকে কাশ্মীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পিছনেও তারাই উস্কানি দিয়েছে।

সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে (১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯) তারা 'ছায়াযুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছে হাফিজ সঈদের লস্কর-ই-তৈবা ও মাসুদ আজহারের জয়েশ-ই-মুহম্মদের সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা। পাক আই এস আই এই যুদ্ধ পরিচালনা করছে সামরিক বাহিনীর সহায়তায়। বিগত সাত দশকে কাশ্মীরের নতুন প্রজন্মকে সুফি-সংস্কৃতি ভুলিয়ে কট্টর ইসলামিক জেহাদি সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত করে তুলেছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন যদি জারি হয় তাহলে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত সরকার কী নীতি গ্রহণ করবেন, এটাই এখন ভারতের সমস্ত মানুষ জানতে আগ্রহী। একটা কথা এখানেই পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, ভারত সরকার এবং ভারতের সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী নয়। তবে যেটা বিভিন্ন মহলে প্রচার করা হচ্ছে, ভারত সরকার শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে শান্ত রাখার প্রয়াস করবেন, সেটা সত্য নয়।

রাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ হবে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে উন্নয়নের ধারাকে আবার সতেজ করা। তরুণদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। পর্যটন শিল্পকে অভয় দেওয়া এবং এবছরের অমরনাথ যাত্রীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা অটুট করা। কোনও ভাবেই যেন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা একটিও সন্ত্রাসের ঘটনা তাঁদের বিরুদ্ধে ঘটাতে না পারে। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর-ব্যবস্থা নেওয়া। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখায় যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন করে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামে যদি মানুষের প্রাণহানি ঘটায়, তাহলে উপযুক্ত জবাব যেমন দেওয়া হচ্ছে, সেটাও একটু বাড়িয়ে, শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 'সার্জিক্যাল স্টাইক' করা হবে কী হবে না, সেটা স্থানীয় সামরিক নেতৃত্বই স্থির করবেন। এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

তবে শুধুমাত্র প্রশাসন নয়, সামরিক বাহিনীকেও শ্রীনগরের প্রতিটি মহল্লায় এবং বিভিন্ন জেলায় প্রতিটি গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার বিষয়, বিশেষ করে খাদ্যাভাব, চিকিৎসার অসুবিধা, কলেজ-বিদ্যালয়ের অবস্থা ইত্যাদি জানতে হবে। অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই যুদ্ধ বন্দুক, কামান দিয়ে জয় করার নয়, হৃদয় দিয়ে, কাশ্মীরি জনগণের হৃদয় মন জয় করতে হবে। ■

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

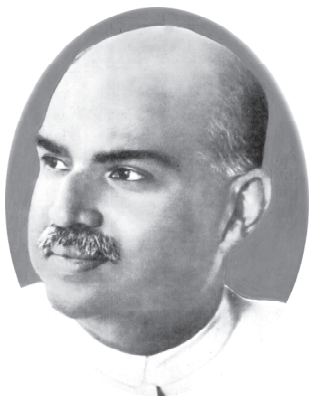

With Best Compliments :-

A well Wisher

Shree Gopal
Jhunjhunwala
Gita Seva Trust

With Best Compliments of :-

MAITHAN ALLOYS LIMITED

P.O. - Kalyaneshwari - 713369
Dist - Burdwan
(west Bengal)
Ph : 0341-6464693 / 6464694,
Fax : 03412521303 / 2522996

Manufacturers of :
FERRO ALLOYS

With Best Wishes
from :

JHUNJHUNWALA

JANKALYAN

TRUST

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

একটি ঐতিহাসিক পত্র

সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদের গর্জন

স্বাধীনতার পর দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বরাভয় চিত্তে নেহরু পরিচালিত ভ্রান্ত আপোশমুখী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বাংলার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আবার ১৯৫০ সালের এপ্রিলে নেহরুর ভ্রান্ত পাকিস্তান নীতির বিরুদ্ধে ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন ও মর্যাদারক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক।

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সচরাচর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কালজয়ী অবদান সম্পর্কে দু'ধরনের একপেশে আলোচনা দেখা যায়। প্রথমটি হলো শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দল হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। এমনকী সাম্রাজ্যবাদী শাসন সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান ছিল আপোশমুখী। আর দ্বিতীয় একপেশে ধারণা হলো তিনি ও তাঁর দল ছিলেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা। এই জন্যই তিনি প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের মধ্যে সংযুক্ত করা যায়নি। বঙ্গ বিভাগের সপক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলে অমুসলিম বাংলাকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়, ভারতের স্বার্থে ও বাঙালি হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য তার প্রয়োজন ছিল।

১৯৪০-এর দশকে শ্যামাপ্রসাদ বাংলার দুর্যোগের দিনে পরিত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকারের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নরমেধযজ্ঞ— এসবের ফলে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরকম কালবেলায় শ্যামাপ্রসাদ আপোশহীন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। গীতার কর্মযোগের আদর্শ তাঁর সংগ্রামী মনোভাবকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

এই প্রবন্ধে আমি সরকারের গোপন নথিপত্র চয়ন করে একটি ঐতিহাসিক পত্রের প্রেক্ষাপট তুলে ধরছি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস নেতারা কারাগারে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল

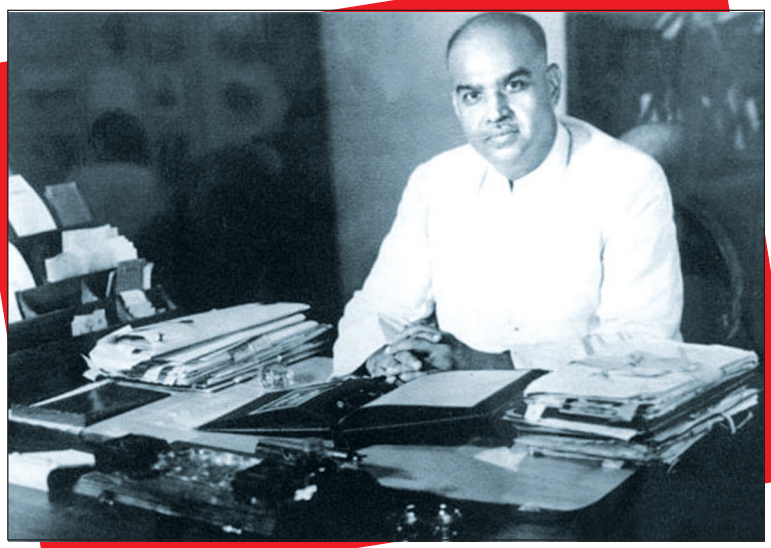

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড শ্যামাপ্রসাদ।

সে সময় শ্যামাপ্রসাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুমিত সরকার মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে (দিল্লি ১৯৮৩, পৃ. ২৩৭ ও ৪১২) লিখেছেন যে, 'ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমনের জন্য পাশবিক দমননীতি গ্রহণ করেছিল, সে সময় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ বাংলার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীর পদে আসীন হয়ে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণে নিমজ্জিত ছিলেন।' সত্যের অপলাপ আর কাকে বলে! মার্কসপন্থী ঐতিহাসিক সুমিত সরকার কি জানেন না যে, সমগ্র ভারত যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে লিপ্ত, সে সময় ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং কমিউনিস্ট নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলেন। মুসলিম লিগকে সরিয়ে হকের নেতৃত্বে প্রগতিশীল কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় বসল (ডিসেম্বর ১৯৪১)। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লিগের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতার অশুভ আঁতাত সফল হলো না। শরৎচন্দ্র বসুও এই মন্ত্রীসভায় যোগ দিতেন। কিন্তু তাঁকে অন্তরীণ করায় তা সম্ভব হয়নি। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র নতুন সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা করতে থাকে। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার পর প্রাদেশিক সরকারকে বিব্রত করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলো।

বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুর জেলা ছিল বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূল স্নায়ুকেন্দ্র। আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী মানসিকতার ছাপ পড়েছিল। সরকারি প্রশাসন তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এদিকে অক্টোবর (১৯৪২ খ্রি:) মাসে ঝড়ঝাপটা ও বন্যার দাপটে উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ত্রাণ নিয়ে সরকার চরম শৈথিল্য ও পক্ষপাতিত্ব করতে লাগল। এই দুর্যোগ অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ ত্রাণের ব্যবস্থা করলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যসচিবকে জানালেন হিন্দু মহাসভার সংগঠকগণ ত্রাণকার্যের আড়ালে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন। ত্রাণের আড়ালে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলছে। হিন্দু মহাসভা অবৈধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই সরকারের পক্ষে এই দলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় হিন্দু মহাসভা শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল।

সরকারের দমন নিপীড়ন নীতি সহ্য করতে না পেরে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বরে তাঁর পদত্যাগ পত্রে শ্যামাপ্রসাদ লিখলেন, মেদিনীপুরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচার ইউরোপে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানির নৃশংস কর্মকাণ্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ অভিযোগ করলেন বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুট করার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে তারাই জঘন্য কাজকর্মে লিপ্ত। তাঁর ভাষায়— "Apart from the manner in which people were fired at and killed, these acts of outrage committed by the government agencies are abominable in character." বোধ করি সমগ্র ভারতে আর কেউ শ্যামাপ্রসাদের মতো জ্বালাময়ী ভাষায় ব্রিটিশ শাসনের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি।

এরপর আসছি শ্যামাপ্রসাদের সেই ঐতিহাসিক পত্রের আলোচনায়। ১৯৪৩ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হককে লিখছেন যে, গত ৯ জানুয়ারি প্রায় দেড়শো সশস্ত্র পুলিশ মহিষাদল থানার অন্তর্গত মাসুরিয়া, চক গাজিপুর, চণ্ডীপুর, লখ্যা এলাকায় পুরুষদের গ্রেপ্তার করে ও তাদের মারধোর করে। এরপর এসব গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঢুকে মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। ছয় দশক পরে ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে স্বাধীন ভারতে এ ধরনের জঘন্য অত্যাচার চলায় কমিউনিস্টরা। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মতো বড়মাপের নেতা না থাকায় এই জঘন্য পরিস্থিতি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়নি।

কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে মন্ত্রীসভা ছিল ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। তবে মুখ্য সচিব জে. আর. ব্লেয়ারকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। জানানো হলো গণধর্ষণ কোনও সভ্য সরকারের পক্ষে কাম্য নয় (gang rape by the unbridled persons on defenceless women can never constitute the policy of any civilised government).

শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক চিঠিটি নীচে দেওয়া হলো। নির্ভীক নেতৃত্বের এ এক অসামান্য দলিল। নিছক ভাবালুতা দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের অবদান ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগিয়ে তাঁর বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ভূমিকাকে নস্যাৎ করা যায় না। ১৯৪২ থেকে এক দশকের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বরাভয় চিত্তে নেহরু পরিচালিত ভ্রান্ত আপোশমুখী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বাংলার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আবার ১৯৫০ সালের এপ্রিলে নেহরুর ভ্রান্ত পাকিস্তান নীতির বিরুদ্ধে ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন ও মর্যাদারক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দেশ ও জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

77, Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta
17th January 1943

My Dear Chief Minister,

Harrowing tales of loot and destruction of properties of civil population and outrage on ladies in certain villages within Mahisadal P.S. in Tamluk, have reached us from various independent sources. These incidents took place on Saturday, the 9th of January last. It is alleged that about one hundred and fifty armed men (it is

not clear if these were members of troops or of armed police force) surrounded in the morning the villages of Masuria, Chak Gazipur, Chandipur and Lakhya in Union No. 11, Mahisadal P.S. They divided themselves into various groups and posted themselves at different points on the main road leading to different villages as also in bushes near about.

Then they carried on searching enquiries into individual houses, forcibly removed the menfolk under arrest and detained them at various places till afternoon. It is alleged these detained persons were severely beaten and some were rendered senseless.

Meanwhile, some of these armed men re-entered into the houses of these villagers, committed outrage on a large number of ladies, destroyed the belongings and decamped with cash and valuables.

I have in my possession written statements of some of the sufferers, including ladies, giving most pathetic descriptions of the incident. The crimes alleged to have been committed were brutal, revolting and unprovoked.

It is essential that there should be an immediate investigation so that the guilty men may be adequately dealt with and proper steps taken to avoid recurrence of such incidents. As you are aware, is such cases panic-stricken people are afraid of giving full information unless they are guaranteed protection. I would request you to visit the place of occurrence yourself or at least to depute one of the Ministers, who should be accompanied by one of two leading non-official gentlemen. There are feelings of great resentment and consternation among the local people some of whom have seen me personally. Action should be immediately taken to protect life and honour of peaceful citizens in areas already greatly affected by acts of both men and nature.

Yours sincerely,

Sd/- Shyama Prasad Mookherjee

The Hon'ble Mr. A.K. Fazulul Huq,

Chief Minister, Government of Bengal.

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,

তমলুকের মহিষাদল থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি লুট এবং তাদের বাড়িতে ঢুকে নির্বিচার তাণ্ডব চালাবার খবর আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি। জানুয়ারির ৯ তারিখে অর্থাৎ গত শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, প্রায় দেড়শো জন সশস্ত্র ব্যক্তি (তারা সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্য কিনা সেটা অবশ্য বোঝার উপায় নেই) মহিষাদল থানার অধীনস্থ ১১নং ইউনিয়নের মাসুরিয়া, চক গাজিপুর, চণ্ডীপুর এবং লাখ্যা গ্রামে ওইদিন সকাল থেকে জড়ো হতে শুরু করে। তারপর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা গ্রামগুলিতে যাবার প্রধান রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে। কাউকে কাউকে ঝোপঝাড়েও লুকিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এরপর শুরু হয় বাড়িতে বাড়িতে হানা। পুরুষদের বাড়ি থেকে বের করে হাত পা বেঁধে বন্দি করে রাখা হয় বিকেল পর্যন্ত। দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে তাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এরই মধ্যে সশস্ত্র দুষ্কৃতীর মধ্যে কয়েকজন বাড়ির ভেতরে ঢুকে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে অবাধ ভাঙচুর এবং লুটতরাজ। নগদ টাকা এবং গয়নাগাঁটি ব্যাপকভাবে লুট হয়েছে বলে অভিযোগ।

আমার নিজের কাছেই কয়েকজন মানুষের (তাদের মধ্যে নারীপুরুষ সকলেই আছেন) লিখিত বিবৃতি রয়েছে। ঘটনার যে বিবরণ তারা দিয়েছেন তা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। দুষ্কৃতীরা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ। সব থেকে বড়ো কথা কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই তারা এ কাজ করেছে।

সুতরাং এই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যাতে দুষ্কৃতীরা বোঝে অপরাধ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং একমাত্র তাতেই ভবিষ্যতে এই ধরনের পৈশাচিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে। আপনি জানেন, অত্যাচারিত মানুষ নিরাপত্তার আশ্বাস না পেলে মুখ খোলে না। আমার অনুরোধ, আপনি নিজে একবার ঘটনাস্থলে যান অথবা আপনার মন্ত্রীপরিষদের কাউকে পাঠান। তবে যিনিই যান তাঁর সঙ্গে যেন রাজনীতি বা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নন এরকম দু-একজন ব্যক্তি থাকেন। সমগ্র এলাকায় তীব্র আতঙ্ক এবং হতাশার পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করে তাদের মনোবেদনার কথা জানিয়েছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার এখানকার মানুষ সারা বছরই প্রকৃতির খামখেয়ালের শিকার। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। আপনি যদি অবিলম্বে এর প্রতিকার না করেন তাহলে হতভাগ্য গ্রামবাসীদের জীবন এবং সম্ভ্রম কিছুই বাঁচানো যাবে না।

—আপনার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

প্রাপক :

জনাব এ.কে. ফজলুল হক

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী

(নথিপত্র স্মারক সংখ্যা ১৬৬/৪৩ স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) গোপন ফাইল (বাংলা সরকার)

তথ্য সূত্র : (১) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়— Dr. Syamaprasad Mukherjee and Quit India Movement– Quarterly Review of Historical Studies (Vol. 26, No. I, 1986).

(২) ঐ (সম্পাদিত)— Midnapur's Tryst with Struggle (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৮)

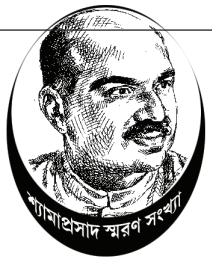

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতী

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক ছিল। ২৮ অক্টোবর ১৯১৩ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পক্ষকাল পূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করতে মনস্থ করেন এবং এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেটে পেশ করেন। ১৩২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরুকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক দান করে। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন সেগুলি পরবর্তীকালে 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' নামে প্রবন্ধ আকারে লিপিবদ্ধ হয়। ১৯৩২ সালের ১ আগস্ট থেকে দু'বছরের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপনাকালে তিনি ছ'টি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রেই শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখুজ্জে পরিবারের যোগাযোগ ছিল এমন নয়। এই সম্পর্ক ছিল আত্মীয় স্বজনের মতো। ১৯০৮ সালে আশুতোষ কন্যা বাল্যবিধবা কমলাদেবীর পুনর্বিবাহ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা ও সামাজিক বাধা সৃষ্টি হলে রবীন্দ্রনাথ স্যার আশুতোষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তেমনি উপাচার্য আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে গুরুপ্রসাদ সিংহ প্রফেসর অব এগ্রিকালচার পদে নিয়োগ করেন।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি রচনা দিয়েছিলেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধ, 'যাত্রা' এবং 'উৎসবের বাঁশি' কবিতা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা দর্শনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদ মতৈক্যে পৌঁছেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলেজি শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। রবীন্দ্রনাথ কখনো ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেননি, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাতৃভাষা চর্চার উপযোগিতা অপরিসীম। ১৮৯১ সালের ১১ জুলাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহমত পোষণ করে উপাচার্য আশুতোষ সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য'কে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব প্রস্তাবটি সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত ১১-১৭ ভোটে পরিকল্পনাটি পরাজিত এবং পরিত্যক্ত হয়। তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার লোক ছিলেন না শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৩৭ সালে সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৮৫৭-১৯৩৭) ৮০ বছরের ইতিহাসে কোনো বেসরকারি ব্যক্তি কখনো সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করেননি। আরও লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন বাংলায়। ইতিপূর্বে ভারতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় কেউ দীক্ষান্ত ভাষণ দান করেননি। রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা- বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।" বক্তৃতাশেষে কবি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন—

"দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা-বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।"

আশ্রম বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সর্বস্তরেই উপাচার্য আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা

এক অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ। (১৯৫০)

লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন শিশুদের যথাযথ ও সার্বিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে। শরীর, মন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে পৃথক।

তিরোধানের এক বছর পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম তথা বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথকে চিন্তিত করেছিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে এলে রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত আবেদন দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন— "I make my fervent appeal to you, accept this institution under your protection giving it an assuarance of permanence, if you consider it to be a national asset." সেই মতো ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো— এই সময় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সংসদে বিশ্বভারতী বিলের যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বিদ্যালয়ের কোনও উল্লেখ ছিল না। বিশ্বভারতী থেকে আশ্রম বিদ্যালয়কে বাদ দিলে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের সম্পূর্ণতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আশঙ্কা করেছিলেন— বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর আশ্রম বিদ্যালয় অবহেলিত হবে। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী স্থাপনের পর আমেরিকা থেকে অ্যান্ডরুজকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "It will grow up into a bully of a brother and browbeat the sweet elder sister into a cowering state of subjection"— রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মর্মবাণীটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুঝেছিলেন। তাই বিশ্বভারতী বিল নিয়ে চারদিন ব্যাপী সংসদে আলোচনা চলাকালে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে স্কুলগুলিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের মাধ্যমে এক অখণ্ড রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন ঘটে। সরকারের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের কাঠামো বা দেহটিকে রক্ষা করা নয়— প্রতিষ্ঠানের আত্মাটিকে রক্ষা করা।

১৯৫১ সালের ২৮ এপ্রিল সংসদে রবীন্দ্রআদর্শ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন— "...This Bill obviously covers the cases of colleges which means institutions after the matriculation stage. According to the Secondary Education Bill which has been passed in West Bengal recently, all high schools in West Bengal will come under the control of the Board. Then what happens to the schools situated in Santiniketan? I am definitely of the view that this Bill will never succeed and Visva-Bharati will never succeed unless you allow Visva-Bharati to maintain its own schools right from the kindergarten stage. There is a new type of secondary education which has been imparted at Santiniketan which in fact, was a special gift of Rabindranath Tagore. That is how Santiniketan's activities started---Unless the child is taken up at the very initial stage it will be impossible to maintain Visva-Bharati at the proper standard. We cannot do that if we allow the University control only over the college. I know the Education Minister's intervention is all right. He wants Visva-Bharati to proper according to the ideals of its founder. If that is his intention and the intention of Parliament and of the whole country, I suggest Government might have a small amendment and add 'schools' also so that the position may be clear beyond any doubt whatsoever..."

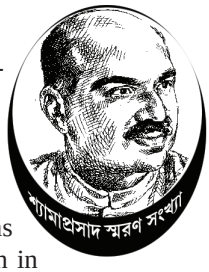

সংসদে বিশ্বভারতী বিল নিয়ে আলোচনায় মৌলানা আজাদ, সি.ডি. দেশমুখ, এ.সি. গুহ প্রমুখ বিশিষ্ট সাংসদের আলোচনায় যে আশঙ্কার কথাটি বারবার উঠে এসেছিল, তা হলো— এই বিলের বন্ধনে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শটি যেন বিঘ্নিত না হয়। এর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি যেন অচলায়তনের মতো প্রস্তরীভূত না হয়। প্রতিষ্ঠানটির আদর্শের স্বাধীনতা যেন সরকারি নিয়ন্ত্রণে লঙ্ঘিত না হয়। কারণ স্বাধীনতা বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫১ সালের ১ মে সংসদে তিনি বলেছিলেন— "...I had during the last few weeks, personally discussed with many people whom I met when they expressed their misgivings as regards the ultimate results which may follow the establishment

বিশ্বভারতীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। (২৪.১২.১৯৫০)

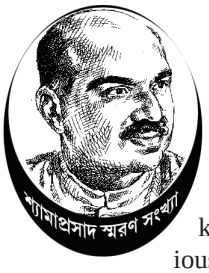

of a statutory University at Santiniketan. The fear generally expressed was that the University might become just a stereotyped institution of the like that we have in different parts of the country. I know that the Maulana Sahib was anxious from the beginning, as in fact he has made it abundantly clear today, that the intention of Government is to maintain intact the great ideals for which the founder stood. For that reason the clarification of the objectives in the words of the founder himself is essential. I knew personally how the mind of Rabindranath Tagore worked with regard to Government control and Government interference regarding Visva-Bharati. As you know, Sir, years ago the institution at Santiniketan was completely independent and I vividly remember the day when he came to meet my revered father who was then in charge of the affairs of the Calcutta University and made a suggestion as regards possible cooperation, between Calcutta University and Visva-Bharati, maintaining intact the complete acadimic freedom of Visva-Bharati, although the Indian Universities Act did not make such cooperation possible. Yet a certain device was made and Visva-Bharati has worked during the last 30 years as an institution where work of a special kind was being accomplished and at the same time its students were being permitted to sit at the examination of the University of Calcutta. Rabindranath's great fear was that if the University comes under official control then its very purpose would become difficult of accomplishment. In fact, as he said in one of his great spuches, its soul was likily to be destroyed. Those who are acquainted with his great writings know of that story which he wrote of a bird which was kept in a golden cage, beautifully served but not alloveed to go out of the cage and how money was lavishly spint on the maintenance of the golden cage which was studded with Jewels and how fruits not fresh from the nature's garden but artificial food-stuff were brought into the cage so that the bird might devolop its own life as the king thought it should. Later on everyone was anxious about the external features of the cage but the poor bird had died and no one took any notice of it. That is how he described the system of education prevalent in this country. He abhorred nothing more than external restrictions and regimentation. It is for this reason that we have to be extremely careful that the objectives of this University should be very clearly laid down by statute and also a constitution should be given to it which would enable it to function properly and make it impossible for any Government to interfere with its internal working...Rabindranath Tagore always used to say, freedom must be the very breath and life of this institution. We should do nothing to destroy that freedom or do anything to regiment the working of this institution. I am fully aware that even though you may pass that Bill, and you lay down with clarity the conditions for keeping its constitution free and unfettered, everything will ultimately depend on how for Visva-Bharati succeeds in collecting within its doors the right type of men and women to carry out the work of the institution. Theirs will be a great responsibility. And if Visva-Bharati attracts the men and women of the right type–and they are not easity available–they by their concerted and united efforts and harmonious endeavours can succeed in making this Bill actually effective. It is only then that our purpose will be served. That is a responsibility which we are throwing on Visva-Bharati; and I have not the least doubt in my mind that with the cooperation of all, although it is situated in one corner of India, with the cooperation of all people from all parts of India and the grat thinkers and savants from the different parts of the world, we will be able to make this institution worthy of its name..."

এই ভাবে সংসদে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর কাঠামো বা দেহ নয়— বিশ্বভারতীর আদর্শ বা আত্মাটিকে রক্ষা করেছিলেন। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদের ক্ষুরধার যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বীকার করে বলেছিলেন— ''I entirely agree with Dr. Mookerjee with he laid stress on certain factors which may be called external if you like, but nevertheless which must have a very powerful influence in moulding the student there and creating a new environment, whether it is the teaching in the mango grove or doing anything like that. I do attach great importance to it and I entirely agree with him that we should not spend our money on a large number of brick structures as we unfortunately still do in making our buildings, whether it is educational buildings or other buildings, and have little left to carry on the work in those buildings." (সংসদের মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে মর্মাহত কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

আশুতোষ বঙ্গচিতে ছিলে বিশ্ববিদ্যার সারথি
তোমারে আপন নামে সম্মানিত করেছে ভারতী
মঙ্গল প্রভাবে তব বঙ্গবাণী বাহনের রথ
জ্ঞান অন্ন বিতরণে লভিয়াছে অন্তরের পথ
তব জন্মভূমিতলে। আমি সেই বাণীর প্রসাদ
পাঠাই উদ্দেশে তব বঙ্গজননীর আশীর্বাদ।

আর রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সংসদে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের মর্মকথাটি তুলে ধরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিশ্বভারতীর আত্মাটিকে সযত্নে রক্ষা করলেন। ■

A True Nationalist by Heart and Follower of Shyamaprasad Mukherjee

Late Shri Harswarup Gupta

Founder & Ex Chairman : Keshav Madhav Saraswati Vidhya Mandir, Kakor, Bulandshahr, UP

Present Chairman : Shri Ashok Gupta
S/o. Late Shri Harswarup Gupta
Res. : 6, Central Drive, DLF Chattarpur Farms
Chattarpur, New Delhi - 110 074
Ph. +91 11 46830202, Email : agupta@amdindustries.com

মঞ্জুভাষ প্রকাশিত

প্রশান্ত প্রামাণিক-এর

কপিল থেকে চন্দ্রশেখর

মূল্য : ৬০০ টাকা

পুরাণ কাহিনীর বিজ্ঞানভাষ্য

মূল্য : ১৬০ টাকা

চিত্র মিত্র -র

বেদান্তের আলোয় গীতাঞ্জলি

মূল্য : ৩০০ টাকা

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক

গুরু বিশ্বাস-এর

স্বপ্নলোকের চাবি

মূল্য : ২৫০ টাকা

পোকা

মূল্য : ২৫০ টাকা

বীজ

মূল্য : ১৭০ টাকা

পণ্যা

মূল্য : ১৫০ টাকা

পরীতলা

মূল্য : ২০০ টাকা

ঝোপড় পট্টি

মূল্য : ২৫০ টাকা

যুথিকা রায়-এর

আজও মনে পড়ে

মূল্য : ১৫০ টাকা

পরিবেশক

প্রিটোনিয়া

১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

বিশেষ প্রতিবেদন

কংগ্রেসে প্রণববাবু এখন গান্ধীজীর মতোই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন

অনেকেই মনে করেন সঙ্ঘের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রণববাবু তাঁর অতীতের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।... সন্দেহ নেই হেডগেওয়ারজীর পৈতৃক ভিটে পরিদর্শনে গিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে প্রণববাবুর লেখা মন্তব্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে।

সাধন কুমার পাল

কংগ্রেস দলের প্রবল আপত্তিকে উপেক্ষা করে গত ৭ জুন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। এই বক্তব্য শুনে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখে আমার একজন হেডস্যারের কথা খুব মনে পড়ছে। ওই হেডস্যার বেয়ারা ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার সময় বলতেন, দেখ আমি এমন জায়গায় বেত মারবো যে দাগ বসে গেলেও লজ্জায় কাউকে দেখাতে পারব না, নীরবে হজম করে নিতে হবে। একথা বলতেন আর পশ্চাৎদেশে বেপরোয়া বেত চালাতেন। নাগপুরের ভাষণে প্রণববাবুও এমন কিছু কথা বললেন যা ওই হেডস্যারের বেত্রাঘাতের মতোই বাক্যাঘাত হয়ে ক্ষতবিক্ষত করলেও বর্তমান কংগ্রেস দলকে লোক লজ্জার ভয়ে ওই বেয়ারা ছাত্রের মতোই নীরবে সব সহ্য করে যেতে হচ্ছে।

কংগ্রেস দলের উদ্দেশ্যে প্রণববাবুর তরফে প্রথম আঘাত তখন আসে যখন তিনি ভিজিটার বুকে লিখলেন, 'আমি আজ ভারতমাতার মহান পুত্র ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছি।' ভারতকে মা বলে ডাকা কংগ্রেসি পরম্পরা নয়। এটা ভারতীয় পরম্পরা, যা সঙ্ঘ অনুসরণ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে মুসলমান তোষণের জন্য দেশকে মা বলে ডাকার মধ্যে কংগ্রেসিরা সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পেয়েছে। কংগ্রেস ও কংগ্রেসি ঐতিহাসিকদের চোখে ডাক্তারজী ছিলেন খলনায়ক, হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িকতার জনক। এহেন কংগ্রেস দলের কাছে প্রণববাবুর বাক্য বেত্রাঘাতের চেয়ে কষ্টদায়ক হবে এটাই স্বাভাবিক।

স্কুল কলেজে পড়ানো হয় যে সিন্ধুসভ্যতা থেকেই ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি। এরপর আর্যরা বাইরে থেকে এসে এদেশের দখল নিয়েছে। প্রণববাবু বলেছেন ভারতীয় সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এক সভ্যতা যা নিরন্তর বিকশিত হচ্ছে। এতদিন এই ভারতীয় সভ্যতার পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যের কথা উঠলেই কংগ্রেস দল-সহ সেকুলার ব্রিগেড মনগড়া ইতিহাস ও গেরুয়াকরণের ধুয়ো তুলে তুলকালাম বাঁধাতো। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রণববাবুর বক্তব্যের পর কি কংগ্রেসি ও সেকুলার ব্রিগেড নিজেদের ভাবনা সংশোধন করবে? প্রণববাবু মুঘলদের, সেই সঙ্গে বাবরকেও মুসলমান আক্রমণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতদিন এই কথাগুলো যাঁরা বলতেন তাঁদের

PBOM

Office : 2269-3527, 2268-7127
Cell : Yogesh Poddar - 98303 04198
Cell : Manish Poddar - 98300 52686
Cell : Anshuman Bagaria - 98301 13354

BHARATI TEL UDYOG PVT. LTD.

(Mfrs. : MOHWA, COCONUT, SUNFLOWER, RICE BRAN SOL. OILS & D-OILED CAKES)

Regd. Office :

187, Rabindra Sarani, 2nd Floor, R. No. 74
Kolkata-700 007

Works :

Sainthia, Dist. : Birbhum (W.B.), Phone : (03462) 262239, 9434030090

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203, 22488036, 37
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

হিন্দুত্ববাদী, মুসলমান বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক বলে গালমন্দ করা হতো। কংগ্রেসি ও সেকুলার ঘরানার পণ্ডিতরা যাঁরা এতদিন তৈমুরলং ও বাবরের মতো বর্বরদেরও শিল্পকলাপ্রেমী, সংবেদনশীল দক্ষ প্রশাসক হিসেবে বর্ণনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তাদের এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা।

বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সঙ্ঘ ভাবাদর্শের লোকেরা যেমন বলে থাকেন প্রণববাবুও ঠিক তেমনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, রাজা অশোকের উল্লেখ করলেও একবারের জন্যও কোনও মুসলমান শাসকের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি লিখিত ভাষণ পড়েছেন, বলার সময় ভুলে গেছেন এটা বলা যাবে না। অথচ অশোক দ্য গ্রেটের পাশাপাশি আকবর দ্য গ্রেটকে স্মরণ করাটা এদেশে পরিচিত কংগ্রেসি কালচার। নিজেদের দলের নেতার মুখে নিজস্ব কালচার বহির্ভূত এই ধরনের বাক্যবান কংগ্রেসিদের কতটা ব্যথিত করেছে সেটা অবশ্য তাঁরাই বলতে পারবেন।

প্রণববাবুর বলেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ও 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'। কংগ্রেসি বন্ধুরা ভাষণের এই অংশটি তুলে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে প্রণববাবু নাকি সংকীর্ণতা ছেড়ে সঙ্ঘকে উদার হওয়ার পাঠ পড়িয়েছেন। ওই দিন মঞ্চে প্রথমে দেওয়া সরসঙ্ঘচালকজীর ভাষণ মন দিয়ে শুনলে হয়তো কংগ্রেস নেতারা এই কথাটি বলতে পারতেন না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে ভাষণ দেওয়ার সময় অনেকবার এই শ্লোক দুটি আউড়েছেন। কংগ্রেসের কোনও প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাহুল গান্ধীর মতো সর্বোচ্চ নেতার মুখে কখনো এই ধরনের শ্লোক শোনা যায়নি। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি এই ধরনের শ্লোক নিয়ম করে পাঠ করে থাকে। কারণ এই শ্লোকগুলি হিন্দুত্বের ভিত্তি। সেজন্য প্রণববাবু যে রাষ্ট্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন তা আসলে হিন্দুত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রবাদের কথাই বলেছেন।

সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রণববাবুর ভূমিকা কী হয়, ভাষণের বিষয় বস্তুই বা কী থাকে সে সব দেখে শুনে নেওয়ার আগেই রণং দেহি মেজাজে সঙ্ঘ-বিরোধী বিষ উগরে দিতে মিডিয়ার সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কংগ্রেস দলের ছোট-বড় সব ধরনের নেতা। ওদের নিশানা থেকে প্রণববাবুও বাদ যাননি। এই ঘটনা থেকে ভারতবাসী কংগ্রেসিদের সেই পুরোনো অসহিষ্ণু চেহারাটা দেখলো। আরও একবার প্রমাণ হলো যে, গান্ধী পরিবারের সদস্য ছাড়া কংগ্রেস দলে অন্য কোনও ব্যক্তি নিরাপদ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, মিডিয়া এই ঘটনাটিকে দীর্ঘ কভারেজ দিলেও মিডিয়ার আলোর আড়ালে থেকে গেলেন যে আমজনতা তাঁরা কী ভাবে দেখছেন ঘটনাটিকে?

সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে প্রণববাবু নাগপুর যাচ্ছেন শুনে আমজনতাকে নানা মন্তব্য করতে শোনা গেছে। চটুল মন্তব্যগুলি বাদ দিয়ে ভাববার মতো কিছু বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। রাজনীতির সাতে পাঁচে নেই এরকম মানুষেরা যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তাঁদের বক্তব্যগুলির মূল সুর এটাই যে, প্রণববাবু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে গিয়ে কোনও ভুল করেননি। কারণ সঙ্ঘ কোনও নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। সঙ্ঘের কাজকর্ম নিয়ে সঙ্ঘের মুখ থেকে যতটা শোনা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি শোনা যায় সঙ্ঘ-বিরোধীদের কাছ থেকে। প্রণববাবুর মতো একজন মানুষ যদি প্রত্যক্ষ ভাবে সঙ্ঘের কাজ দেখে এই সংগঠন সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন তৈরি করতে চান তাহলে ক্ষতিটা কোথায়? সঙ্ঘ প্রণববাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যার একটাই অর্থ সঙ্ঘের তরফে লুকোনোর কিছু নেই। আর সঙ্ঘ কোনও ভুঁইফোঁড় সংগঠনও নয়। শতবর্ষ হতে চলেছে সঙ্ঘ স্থাপনার। সঙ্ঘের ভাবাদর্শ দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির জন্মদাতা। এই সমস্ত সংগঠনকে বাদ দিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষকে ভাবা যায় না। যেমন বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, বিদ্যা ভারতী, ভারতীয় জনতা পার্টির মতো ডজনখানেক সংগঠন আছে যাদের নাম আধুনিক ভারতের পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সঙ্ঘকে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তব থেকে মুখ ঘুরিয়ে সময়ের আহ্বানকে অস্বীকার করা।

কংগ্রেস দলের সঙ্গে সঙ্ঘের মতাদর্শগত অমিল থাকতেই পারে, তাই বলে কথা বলা যাবে না এমন তো নয়। চরম শত্রুর সঙ্গে কথা বলে বৈরী ভাব কমিয়ে আনা এটাই ভারতের শাশ্বত রীতি। মহাভারতেও দেখা গেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার দৌত্যকর্ম চালিয়েছেন। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে বিরোধী মতাদর্শের কাউকে খতম করে দেওয়াই প্রচলিত রীতি। ভাবাদর্শগত এই অসহিষ্ণুতার জন্যই কমিউনিস্টরা এখন শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বেই বিলুপ্তপ্রায়।

দল হিসেবে কংগ্রেস এখন মাতা-পুত্রের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস যখন থেকে গান্ধী পরিবারের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তখন থেকে পারিবারিক বশ্যতা অন্যথায় অসহিষ্ণুতা, আদর্শচ্যুত কংগ্রেস দলের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। ইতিহাস বলছে এই কংগ্রেসি অসহিষ্ণুতার যূপকাষ্ঠে বলি হতে হয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো দেশবরেণ্যদের, সঙ্ঘকেও নিষিদ্ধ হতে হয়েছে একাধিক বার। দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের লুপ্তপ্রায় অবস্থা থেকে এটা বলা যায় অসহিষ্ণু ভাবধারা ভারতের মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে না।

অনেককেই বলতে শোনা গেছে প্রণববাবু এখন জীবনের শেষ লগ্নে, রাজনৈতিক চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে একজন অনুভবী ব্যক্তিত্ব। এখন তিনি অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দেবেন এটাই স্বাভাবিক। জরুরি অবস্থার সময় প্রণববাবু ইন্দিরা-ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সঙ্ঘের উপর অন্যায় ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি ও দমন পীড়নের জন্য শেষ বয়সে তাঁর পশ্চাত্তাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। অনেকেই মনে করেন সঙ্ঘের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রণববাবু তাঁর অতীতের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। গান্ধীজী এবং ড. বি আর আম্বেদকর সশরীরে সঙ্ঘের শিবিরে গিয়ে অস্পৃশ্যতা মুক্ত পরিবেশ দেখে আপ্লুত হয়ে সঙ্ঘ সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তা এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। সন্দেহ নেই হেডগেওয়ারজীর পৈতৃক ভিটে পরিদর্শনে গিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে প্রণববাবুর লেখা মন্তব্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে। ■

Top Star Lightings

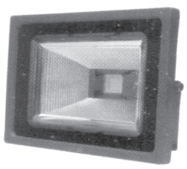

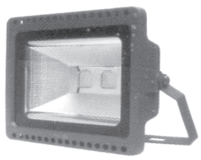

55, Ezra Street (Yamuna Bhawan)

1st Floor, Kolkata - 700 001

Ph. : 033-4024 1061, SMART# 1061

E-mail : topstarlightings@gmail.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকলে আগামী দু'দশকে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে পড়বে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ জাতীয় সংসদে আগামী অর্থ বছরের বাজেট (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯) উপস্থাপিত হওয়ার পর পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, এবারের বাজেটও অতীতের মতোই ধর্মীয় বৈষম্যের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ৭ জুন বাজেট পেশ হয়। ৯ জুন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত 'বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান চাই' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত বলেছেন, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের কারণে প্রতিদিন ৬০০ জন মানুষ দেশত্যাগ করছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী তিন দশক পর বাংলাদেশে কোনও সংখ্যালঘু থাকবে না। ড. বারাকাত বলেন, ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রকৃত অর্থে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ৭১-এ মুক্তি যুদ্ধে বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চেয়েছিলাম, অসাম্প্রদায়িক মানসগঠন চেয়েছিলাম। বাস্তবে তার কোনটিই হয়নি।

তিনি বলেন, ১৩১টি জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশে বর্তমানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি। মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যেও রয়েছে মৌলবাদ। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে জনগণ আজ সম্মান চায় উল্লেখ করে ড. বারাকাত বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন সভ্য সমাজের লক্ষণ নয়। ধর্মকে রাজনীতিতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের ব্যবহারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ বলেন, এ জন্যে বাঙালি মুক্তি যুদ্ধ করেনি।

ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় মূল নিবন্ধ ও তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন যথাক্রমে আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত ও মণীন্দ্র কুমার নাথ। আলোচনায় আরও অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, অর্থনীতিবিদ ড. রমণীমোহন দেবনাথ, স্বপন ভট্টাচার্য এমপি, মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, পঙ্কজ দেবনাথ এমপি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী, জাতীয় পার্টির নেতা সুনীল শুভ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায়, অধ্যাপক ড. অরুণ গোস্বামী, ছাত্রনেতা বাপ্পাদিত্য বসু, ব্যারিস্টার প্রশান্ত বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, বেসরকারি সংস্থা এ এল আর ডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত এক লিখিত প্রতিবেদনে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে হজ নীতি, হজ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন, হজ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি তীর্থভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। হজ বিষয়ক খাতে বাজেটে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩ কোটি ৫৮ লাখ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪২ কোটি ৯২ লাখ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৪ কোটি ৩০ লাখ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৯ কোটি ৩৯ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৯ কোটি ৭১ লাখ অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে মোট ২৪৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থভ্রমণের জন্যে অতীতের মতোই চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) কোনও বরাদ্দ রাখা হয়নি। বাজেট বরাদ্দ থেকে আরও দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩০ লাখ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ লাখ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লাখ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৭ লাখ অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে মোট ২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও তদনুরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় উপাসনালয় পরিচালনার জন্যে চলতি বাজেটে অতীতের মতোই কোনওরূপ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজের মধ্যে ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৮ লাখ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ লাখ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লাখ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৫ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৯ লাখ অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে মোট ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অতীতের মতোই এবারের বাজেটেও কোনও বরাদ্দ নেই। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ইমাম ও মুয়াজ্জিন ট্রাস্ট খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২ কোটি ৪০ লাখ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২ কোটি ৫৭ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ কোটি ৭৫ লাখ অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে মোট ১১ কোটি ৭২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজের পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজকদের জন্য অনুরূপ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনে পূর্বের মতোই চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও কোনওরূপ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে দেখা যায়, জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯১ কোটি ৫৯ লাখ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৬৮ কোটি ৮৮ লাখ অর্থাৎ এই দুই অর্থবছরে মোট ৪৬০ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজের জন্যে অনুরূপ মডেল মন্দির/ প্যাগোডা/গির্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে বাজেটে কোনও বরাদ্দ নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে দেখা যায়, ইমাম প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২ কোটি ৯৮ লাখ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ কোটি ৫৩ লাখ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫ কোটি ৬৮ লাখ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬ কোটি ৮০ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৭ কোটি ৯৫ লাখ অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৭৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য

ফঃ ৫

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে কোনও বরাদ্দ না থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ও সেবায়েতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত আছে।

গত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনায় মাথাপিছু বরাদ্দের চিত্রটি আরও করুণ এবং দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের সরকারি লোকগণনার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে দেখা যায় প্রকল্প বাদে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ যেক্ষেত্রে ১১ থেকে ১২ টাকা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ সেক্ষেত্রে মাত্র ৩ টাকা। যদিও সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমভাবে দেখতে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবেদনে প্রশ্ন করা হয়েছে, জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ হিসেবে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অবশ্যই মোট বরাদ্দের বৃহত্তর অংশ পাবে, কিন্তু মাথাপিছু বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য হবে? আমরা মনে করি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিদ্যমান বৈষম্য জিইয়ে রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বাজেট বৈষম্য আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ দুঃখ করে বলেছেন, সব কিছু আজ চলে গেছে বেসরকারি খাতে, তবে ধর্মটা রয়ে গেছে সরকারি খাতে। গণতন্ত্র চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে। ড. আর এম দেবনাথ বলেন, বর্তমান সরকার অসাম্প্রদায়িক দাবি করলেও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিচিত্র সংমিশ্রণে ঘটনানো হয়েছে। আওয়ামি লিগ সাংসদ পঙ্কজ দেবনাথ ধর্মীয় বাজেটসহ সর্বক্ষেত্রে বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে বলে সেখানকার সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করে না। আর বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়া বারবার বিঘ্নিত হয়েছে বলেই দেশ পাকিস্তানি উত্তরাধিকারিত্ব থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি। রাজনীতিতে কুটিল ব্যবস্থা ও সর্বক্ষেত্রে চাতুর্য চলছে বলে উল্লেখ করে আওয়ামি লিগ সাংসদ স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, সংসদের ভেতরে-বাইরে বৈষম্য নিরসনে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া দাবি আদায়ের বিকল্প কোনও পথ আজ আর খোলা নেই। তিনি বলেন, সবক'টি রাজনৈতিক দল স্বৈরশাসনের ভেতর দিয়ে চলেছে। তিনি বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। আওয়ামি লিগ সাংসদ মনোরঞ্জন শীল গোপাল পাকিস্তানি আমল থেকে আওয়ামি লিগকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা 'ভারসাম্য' করেনি উল্লেখ করে বলেন, আওয়ামি লিগও 'ভারসাম্য' করে চলুক এটা আমরা চাই না। তিনি হেফাজতে ইসলামের নির্দেশে পাঠ্যবই ইসলামিকরণের দিকে ইঙ্গিত করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, কারও বিশেষ প্রেসক্রিপশনে পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন নিয়ে এলে কষ্ট হয়। বাজেটে বিগত দু' বছর যাবৎ হিন্দু মন্দির উন্নয়নের কথা বলে দু'শ কোটি টাকার মুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, রাষ্ট্রীয় এ অঙ্গীকারের জন্যে কেন তদ্বির করতে হবে? বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা 'সাম্য' থেকে রাষ্ট্র আজ অনেক দূরে চলে গেছে। জাতীয় পার্টির নেতা সুনীল শুভ রায় সারা দেশে বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্যে এরশাদের আমলে তৈরি করা হয়েছে তিন কল্যাণ ট্রাস্ট। আজও এই ট্রাস্ট অব্যাহত আছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরাসরি রাষ্ট্রীয় বরাদ্দে পরিচালিত হলেও এই ট্রাস্টগুলোর জন্যে করে দেওয়া হয়েছে স্থায়ী আমানত, এই আমানতের সুদের টাকায় পরিচালিত হয় কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা এভাবে প্রতারণার নির্লজ্জ শিকার হচ্ছে। এর একটি বাস্তব চিত্র হলো— বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২১ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত থেকে বছরে সুদ আসে আনুমানিক ১ কোটি টাকা। এ টাকার প্রায় পুরোটাই ব্যয়িত হয় এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিচালনায়। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, সম্প্রদায়গত কল্যাণে ট্রাস্টের ভূমিকা কী? পরন্তু হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১০ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীর মধ্যে ৫ জন মুসলমান সম্প্রদায়ের। একইভাবে মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে সারা দেশের ৬৪ জেলার প্রতিটি জেলায় ৪ জন করে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ শতাংশও মুসলমান সম্প্রদায়ের। প্রশ্ন তুলেছে ঐক্য পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় বা সারা দেশে কর্মকর্তা- কর্মচারীর মধ্যে একজনও কি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ পেয়েছে?

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সূচনা থেকে কল্যাণ ট্রাস্টগুলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সমমর্যাদার ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান সরকারও বিএনপি এবং এরশাদের জাতীয় পার্টির সরকারের মতোই এ দাবি কানে তোলেনি। বাজেট আলোচনায় বক্তারা বলেন, সব সরকারই সমমর্যাদার বিষয়টিকে দূরে রাখতে চান। ■

মহেশ ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড

৩০/৪, ক্যানেল ইস্ট রোড,

কলকাতা - ৭০০০১১

ফোন : ২৩৫২৪০৬৪/৪০৯০

Mahesh Laboratories Pvt. Ltd.

30/4, Canal East Road

Kolkata- 700011

Ph. 23524064 / 4090

বিজ্ঞান গবেষণায় ও শিল্পে স্বামীজীর অনুপ্রেরণা

১৮৯৩ সালের জুলাই মাস। ইয়াকোহমা থেকে ভ্যাঙ্কুবারের সাগরপথে চলেছেন দুই মহান ভারতীয় যাত্রী। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, অপরজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পপতি। সন্ন্যাসী আগ্রহী হয়েছেন ভারতাত্মাকে পশ্চিমের কাছে উন্মোচনে, শপথ নিয়েছেন সনাতন ধর্ম ও দর্শনকে সম্প্রসারণ করতে। আর শিল্পপতি ইস্পাতশিল্পের জন্য প্রযুক্তি- প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাচ্ছেন। তাঁর লক্ষ্য ভারতকে সবল শিল্পোন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। প্রথম জন স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় জন জামসেদজী নুসারওয়ানজী টাটা। স্বামীজী টাটার চাইতে ১৬ বছরের ছোটো। তবু স্বামীজী জামসেদজীকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, আমরা যদি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতের তপস্যা ও মানবতার সমন্বয় করতে পারি তাহলে কী আনন্দেরই না হবে।

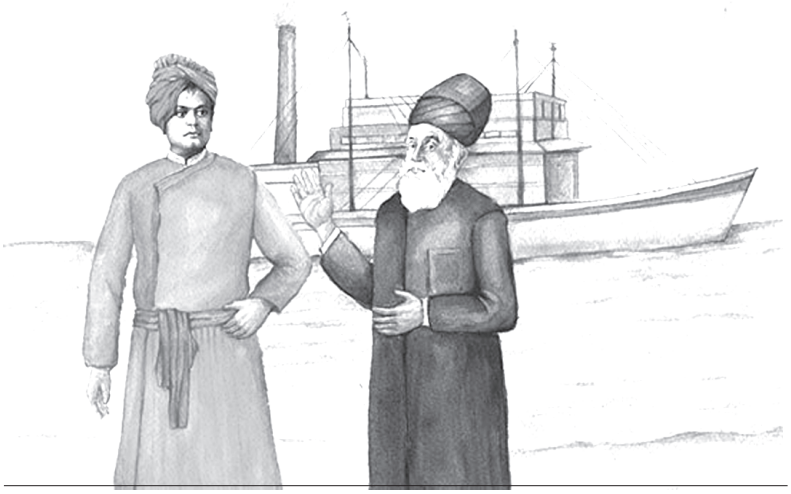

এই জাহাজযাত্রার কথোপকথন স্বামীজী তাঁর ছোটোভাই মহেন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথের লেখায় আমরা জানতে পারি স্বামীজী ও জামসেদজী একসঙ্গে জাপানের একটি দেশলাই কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং জাপানের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। স্বামীজী অবাক হয়ে জামসেদজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, দেশলাই কারখানা ভারতে তৈরি না করে জাপান থেকে দেশলাই আমদানি করছেন কেন? ভারতে যদি কারখানা তৈরি করা যায় তাহলে বহু যুবকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

জামসেদজী এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্বলন্ত শক্তি অনুভব করলেন। সন্ন্যাসী যখন কথা বলছেন তাঁর চোখ প্রদীপ্ত। আবার ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। ভারতবাসীর পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই, মগজে জ্ঞান নেই। পরিব্রাজক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন তিনি। অভুক্ত অথচ অতুল্য ভারতের কথা তুলে ধরছেন। দেশের রাজা মহারাজা আর শিক্ষিত মানুষরা গরিব দেশবাসী সম্পর্কে উদাসীন। তবু দেশের প্রকৃত আশার জায়গা কিন্তু আপামর দেশবাসী, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাদের শিক্ষা দিতে হবে, মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে। সেজন্য শিল্প চাই। তবেই ভারত স্বাবলম্বী হবে।

জামসেদজী স্বামীজীর এই আকুতি মনে রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন বাদে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আলাপচারিতায় তা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, জাপানবাসী যখন স্বামীজীকে দেখলেন, তাঁর মধ্যে ভগবান বুদ্ধের ঐশ্বরিক মিল খুঁজে পেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জামসেদজীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্দেশনার জন্য তিনি স্বামীজীকেই প্রস্তাব পাঠান। স্বামীজী প্রস্তবে আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, তিনি নয়, অন্য কোনও উৎসাহী যোগ্য যুবককে এই দায়িত্ব দিতে হবে।

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত টাটার গবেষণা প্রকল্প ইংরেজ সরকার প্রথমে নাকচ করে দেয়। কিন্তু নানা মহল থেকে সরকারের ওপর চাপও মন্দ ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের মাধ্যমে স্বামীজী নিরন্তর জামসেদজীকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ১৯০২ সালের ৪ জুলাই আর ১৯০৪ সালের ১৯ মে জামসেদজীর মৃত্যু হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার টাটা গবেষণা প্রকল্পে ছাড়পত্র দেয়। ১৯০৭ সালে স্বামীজীর শিষ্য মহীশূরের মহারাজ তাঁর গুরুর স্বপ্ন পূরণের জন্য বেঙ্গলুরুতে ৩৭০ একর জমি দান করেন। ১৯০৯ সালের ২৭ মে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর সেই জমির ওপরেই গড়ে ওঠে (১৯১১) টাটা ইনস্টিটিউট, আজকের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স।

ভারতের মৌল বিজ্ঞান গবেষণায় দুই সেরা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (টাটা ইলস্টিটিউট), বেঙ্গালুরু এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, মুম্বই তৈরি হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায়।

ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী।

ভারতের পথে পথে

উদয়গিরি

ওড়িশার ললিতগিরি থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মর্মকেন্দ্র উদয়গিরি। উদয়গিরি ও রত্নগিরির মাঝে বয়ে চলেছে কিমিরিয়া নদী। রাজ্যের বৃহত্তম বৌদ্ধকেন্দ্র হিসেবে এর পরিচিতি। এখানে ৩মিটার উঁচু ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্ম হাতে লোকেশ্বর বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিতে অষ্টম শতকের লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। কথিত, সপ্তম শতকে নালন্দা থেকে এখানে তন্ত্রগুরু সাহারাপাদ এসেছিলেন। অতীত দিনের ভাস্কর্য রেপ্লিকা করে এখানে রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে দু'হাজার বছরের প্রাচীন বাপী অর্থাৎ কুয়ো। পানীয় জল হিসেবে এর জল ব্যবহার করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। জনশ্রুতি, এই কুয়োর জলপানে নানান ব্যাধির নিরাময় ঘটে।

জানো কি?

- পায়রা শান্তির প্রতীক।
- সাদা ছড়ি অন্ধের প্রতীক।
- নীল ফিতা ক্লোন ক্যানসারের প্রতীক।
- গোলাপি ফিতা স্তন ক্যানসারের প্রতীক।
- লাল গোলাপ ভালোবাসার প্রতীক।
- ভারত ও চীনের সীমা নির্ধারক কাল্পনিক রেখার নাম ম্যাকমোহন লাইন।
- ব্যাপক দুগ্ধ উৎপাদনকে শ্বেত বিপ্লব বলা হয়।

ভালো কথা

ছাদের গাছে স্কুলে বাগান

পাঁচ বছর হলো বাবুদারা বাড়ি করেছে। বাবুদা বাড়ির ছাদে নানা রকম ফল ও ফুল গাছের বাগান করেছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ বাগান দেখতে আসে। সবাই খুব প্রশংসা করে। সেদিন বাবুদার মামা এসে সব দেখেশুনে নাকি বলেছেন বাগান তো ভালো কিন্তু ছাদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শুনে বাবুদার বাবা সব গাছ রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। সন্তুর জেঠুর কথামতো আমরা গাছগুলি নিয়ে আমাদের স্কুলের মাঠের এক ধারে সুন্দর করে লাগিয়েছি। সেদিনের বৃষ্টির জল পেয়ে গাছগুলি যেন হাসছে। গাছ ফেলে দেওয়ার দিন বাবুদার মন খুব খারাপ ছিল, আজ স্কুলে এসে সুন্দর বাগান দেখে খুব খুশি হয়েছে।

শ্রেয়া মল্লিক, ষষ্ঠশ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) গ্ন গো লি ল	(১) ম গ মা স ন জ
(২) তি ঘ ব ন	(২) কা র তা ত ভি শো

১৮ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) ফলভারাবনত (২) বিদ্বেষপরায়ণ

১৮ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) নিয়মভঙ্গকারী (২) পদলেহনকারী

উত্তরদাতার নাম

(১)সৌম্য নাগ, কেটারডাঙ্গা, বাঁকুড়া। (২) রতন রায়, ফাটাপুকুর, জলপাইগুড়ি। (৩) নন্দিতা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া। (৪) ঋতম পাল, গাজোল, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SKJ CONSULTANT & FINANCIERS PVT. LTD.

(FRANCHISEE OF ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED)

TIN FACILITATION CENTRE & PAN CENTRE

CERTIFIED FILING CENTRE

FOR MCA-21

E-FILING OF INCOME TAX RETURN

5, Commercial Building, Ground Floor, 23A Netaji Subhas Road , Kolkata-700 001,

Phone : 2242-8964, 4005-0066 E-mail : sunil_skj@rediffmail.com,

sunil_skj@hotmail.com, sunilskj10@gmail.com

H.O. : 6, CommercialBuilding, 1st floor, 23A Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

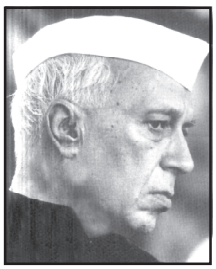

ড. শ্যামাপ্রসাদের রহস্যমৃত্যুর পর জওহরলাল নেহরুকে লেখা যোগমায়াদেবীর চিঠি

প্রিয় নেহরু,

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে আপনার ৩০ জুনের পত্র আমি ২ জুলাই পেয়েছি... আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে সমগ্র রাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত। ...আমার পুত্রের মৃত্যু তখন হয়েছে যখন সে নজরবন্দি ছিল। বিশেষ করে যখন তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিচার চলছিল না তখন তাকে নজরবন্দি রাখা হয়েছিল। ...আপনি আপনার পত্রে সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, কাশ্মীর সরকার আমার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য যথাসম্ভব সবকিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু আপনার স্পষ্টীকরণের কোনো মূল্যই নেই, যখন আমার পুত্রের রহস্যময় মৃত্যুর জন্য যাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো উচিত সে বিষয়ে আপনি নিরুত্তর রয়েছেন। ...আমার পুত্রের মৃত্যুরহস্য কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে। এই মৃত্যুরহস্য আপনার কাছে হৃদয় বিদারক ও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে না কি? শ্যামাপ্রসাদ সামান্য হাঁটাচলার জন্য একটু খোলা জায়গার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিল যার জন্য তার শরীর অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ সুবিধা না দিয়ে তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তাছাড়া সে যখন অসুস্থ তখন চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছিল না। কারণ চিকিৎসা রিপোর্ট সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী, তাই একে চিকিৎসায় অবহেলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি এ পত্র মারফত বিলাপ করছি না বরং ভারতের একজন কৃতী সন্তান কীভাবে মারা গেল তার নিরপেক্ষ এবং খোলাখুলি তদন্ত হোক এটুকুই এক বলিদানী পুত্রের মায়ের একান্ত অনুরোধ। আরো আমি বলতে ইচ্ছুক, এই বিষয়ে আপনার সরকার কেন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল? আমি ভারতের সমস্ত মাতাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আপনি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করুন যার ফলে সত্য উদ্ঘাটিত হয়। এই বিষয়ে ঈশ্বর যেন আপনাকে সৎসাহস প্রদান করেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি আর তার হস্তলিখিত কাগজপত্র আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত জিনিসগুলি অবশ্যই তাদের কাছে আছে।

ভবদীয়া—

দুঃখিনী যোগমায়া দেবী

নিউ দিল্লি

৫ জুলাই ১৯৫৩

মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার

অঙ্গনা

সৌমী দাঁ

(পর্ব-৩)

আগের দুটি পর্বে মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার এবং বিয়ের আগে ও পরে এবং দ্বিতীয় পর্বে স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার এবং বিয়ে ভাঙলে তার শ্বশুরবাড়ির ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছিল।

আজকের বিষয় হলো স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে ও শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিতে মেয়েটির কী অধিকার। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক সময় শ্বশুরবাড়িতে অনেক মেয়ের অবস্থান নড়বড়ে ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। আত্মীয়স্বজন দ্বারা নানা ভাবে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু একজন মহিলা যদি নিজের অধিকার নিয়ে সচেতন হন, তবে তাঁকে বঞ্চনার শিকার হতে হয় না।

স্বামী মারা গেলে

স্বামী মারা গেলে শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ি, দুই জায়গাতেই তার সমান অধিকার বজায় থাকে। যে কোনও বয়সের বিধবা মহিলার বাপের বাড়িতেও যেমন অধিকার থাকে, তেমনই শ্বশুরবাড়িও তার প্রাপ্য অধিকার অস্বীকার করতে পারে না।

• স্বামীর মৃত্যু হলেও বিধবা মহিলা তার শ্বশুরবাড়ির ভিটেতে থাকতে পারে। বিধবা মহিলার শ্বশুরের ভিটেতে সম্পূর্ণ আইনি অধিকার আছে। তাকে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বার করে দেওয়া বেআইনি।

• বিধবা মহিলার স্বামীর মৃত্যুর পরও স্বামীর অথবা শ্বশুরের বাড়িতে থাকার অধিকার অক্ষুণ্ণ। সে তার ইচ্ছামতো স্বামীর বা শ্বশুরবাড়ি অথবা সেই সঙ্গে বাপের বাড়িতেও থাকতে পারে। দুই জায়গাতেই তার আইনগত থাকার অধিকার আছে।

• বিধবা মহিলার বাবার, স্বামীর ও শ্বশুরের সম্পত্তিতে অধিকার আছে সমানভাবে। এরকম নয় যে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এলে তার অধিকার চলে যাবে। স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির সব কিছুর ওপরেই তার ও তার সন্তানের অধিকার থাকে। একইসঙ্গে বাপের বাড়ির সম্পত্তিতেও সব অধিকার বজায় থাকবে।

• হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স আইন অনুযায়ী বিধবা মহিলারা শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে স্বামীর মৃত্যুর পর বা স্বামীর অবর্তমানে ভরণপোষণও পেতে পারেন।

• পরলোকগত স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার বর্তায় ঠিকই, তবে পুরোটাই তিনি পাবেন না। স্ত্রী-সহ সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারী যারা জীবিত আছেন তারা সকলেই ওই ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দাবিদার। অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী পাবেন একটা সমান অংশ।

লিভ-ইন রিলেশনশিপে মহিলাদের অধিকার

যেসব মহিলারা লিভ ইন রিলেশনশিপে আছেন তাদের জন্যও কিছু আইনি অধিকার আছে। আজকাল লিভ ইন রিলেশনশিপও আইনগত স্বীকৃতি পাচ্ছে। যেসব মহিলা লিভ ইন রিলেশনশিপে আছেন, সঙ্গীর কাছ থেকে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন তারাও। যদি কোনওভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে প্রতারণা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন তবে আইন আছে, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও আছে।

• দত্তক মেয়ের অধিকার

এখানে বলে রাখা ভালো যেসব মেয়ে অ্যাডপটেড, সেই মেয়েদেরও আইনি অধিকার আছে। অ্যাডপশান ডিড অনুযায়ী মেয়েটির আইনি অধিকার থাকবে। যদি কোনও মেয়েকে কোনও পরিবার থেকে আইনত দত্তক নেওয়া হয়, সেই মেয়ে বা মহিলার অন্য ভাই বোনদের সঙ্গে তার বাবার সম্পত্তিতে সমান অধিকার থাকবে। বিয়ের আগে বা পরে একইভাবে সেই মেয়েটিরও সমান অধিকার থাকবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে। পৈতৃক সম্পত্তিতে সে সমানভাগে ভাগীদার। সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর তার অন্যান্য উত্তরাধিকারদের সঙ্গে সমান অধিকার থাকবে। সেই মেয়েটি যদি বঞ্চিত হয় আইনের দ্বারস্থ হতে পারে। বাবার মৃত্যুর পরও তাকে তার বাবার বাড়ি থেকে কেউ বিতাড়িত করতে পারবে না।

এখানে একটা বিষয় একটু বলে রাখা ভালো। অনেক সময় মেয়েরা একা ও অসহায় হয়ে পড়েন। কারুর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পান না, বরং নানা ভাবে বঞ্চনার শিকার হন। এরকম অবস্থায় কোথায় যাবেন কোথা থেকে আইনি সাহায্য পাবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাদের জন্য কিছু আইনি সহায়তার ব্যবস্থা আছে। মেয়েরা যাতে আইনি সাহায্য পায় ও তাদের অধিকার উপভোগ করতে পারেন, কোনওরকম বঞ্চনা বা প্রতারণার শিকার না হতে হয় সেজন্য তাদের জন্য আইনি প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে সহায়তা কেন্দ্রও আছে।

বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার ব্যবস্থা আছে। যে কোনও মহিলা এই পরিষেবার সাহায্য নিতে পারেন। প্রতিটি জেলা আদালতে বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে এই বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার অফিস আছে। সেখানে তার সাহায্য পাবেন।

(লেখিকা পেশায় আইনজীবী)

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

২ জুলাই (সোমবার) থেকে ৮ জুলাই (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি, কর্কটে বুধ। শুক্র-রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি এবং মকরে বক্রী মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে ধনিষ্ঠা থেকে মেষে অশ্বিনী নক্ষত্রে।

মেষ : নিয়ম না মেনে পথচলায় শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ, সাহিত্য পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ। সৃজনশীলতায় মানবিক মুখ। সন্তানের কর্মসংস্থানের যোগ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রেমের যোগ। দূর ভ্রমণে ব্যয় ও আনন্দ লাভ।

বৃষ : মন-মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ, শ্রী ও সুন্দরের পূজারি। আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি। ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি, বিবাহ অথবা নবজাতকের আগমনে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি। কারিগরি দক্ষতা ও বাজারমুখী শিক্ষায় অভীষ্ট লাভ। বাগ্মিতা ও বুদ্ধিমত্তায় সামাজিক সম্মান ও শংসা প্রাপ্তি।

মিথুন : শরীর, মন, বুদ্ধি নানারকম জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকবে। বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও বিচারকের প্রতিভার সুকৃতী-যশ-প্রতিষ্ঠা। সহোদরের ভাগ্যোন্নতির দরজা উন্মুক্ত, শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় নব উদ্যোগ। গৃহ, জমি ও বাহন যোগ।

কর্কট : বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ। পারিবারিক প্রতিকূল পরিবেশ। মাতৃস্থানীয়ার অসুস্থতা, মানসিক উদ্বেগ। শিক্ষা-জ্ঞানার্জন, শেয়ারে ফাটকায় ইতিবাচক ফল। গান-বাজনা, ক্রিয়েটিভ আর্টসে যশ-খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তি। সপ্তাহের শেষভাগে রমণীর প্রতি আকর্ষণ।

সিংহ : লাইফ পার্টনারের শরীরের যত্ন নিন, বাড়ি, গাড়ি ও বিলাস ব্যসনে আনন্দঘন পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নিকট ভ্রমণের যোগ। হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সমাজ প্রগতিমূলক কাজে সমভাগী ও মানসিক প্রশান্তি। বয়স্ক মিত্র শুভ নয়, রাজনৈতিক নেতাদের দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততাবৃদ্ধি।

কন্যা : গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা। ধর্ম-কর্ম-শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সফল মনস্কাম। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদারতা। সাহিত্য পিপাসুদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'র ন্যায় ব্যবসার প্রসার, বিত্ত ও অভিজাত গৌরব।

তুলা : পুত্রের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে সফলতা অর্জনের যোগ। দালালি, প্রমোটিং, ক্রীড়াবিদ, কুস্তিগিরের স্বচ্ছন্দ পদচারণা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, পুরাতন বাড়ির সংস্কার ও শরীরের কারণে ব্যয়। রমণীর প্রতি দুর্বলতা।

বৃশ্চিক : বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যানুরাগীর সামাজিক অনুষ্ঠানে সমাদর লাভ। সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মন, অন্ত্যজশ্রেণীর সহায়তায় সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাতের সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা।

ধনু : গৃহে আত্মীয় পরিজন সমাগমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। মাতৃসুখ। বাড়ি ও বাহন যোগ। নিজ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় কর্মে সাফল্য, শত্রুজয়ী। বস্ত্র-ওষুধ-স্বর্ণ-শৌখিন ও বিলাসদ্রব্য ব্যবসায় লক্ষ্মীর কৃপালাভ ও পার্থিব সুখ। প্রেমের চাতক দৃষ্টিতে সাফল্যের সিক্ত বারিধারা। সন্তানের চলাফেরায় নেতিবাচক পরিবর্তন।

মকর : জেদভাব, চাতুরি, চিন্তায় দোদুল্যমানতা, আইনি জটিলতা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। আলস্য ও উদাসীনতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। আয়ের শ্লথ গতি।

কুম্ভ : রিপ্রেজেন্টেটিভ, শেয়ারস আমদানি, রপ্তানি, খনিজ ও রত্ন ব্যবসায়ীর শুভ। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস ও গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ। প্রকাশক, উকিল, সার্ভেয়ার, সফটওয়ার, আর্কিটেকচার, গণিতজ্ঞের দক্ষতার বহুমুখী প্রয়াস ও মান্যতা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের শুভ সময়।

মীন : কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে অনুকূল সময়। শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসনা, সহানুভুতি ও সমবেদনায় ভরা মন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ফল ও হৃদয়ের বিকাশ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পিতার চোখ ও হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেবে। ত্যাগ, শান্তি ও স্বস্তি।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য

ফঃ ৬

রেললাইনে নয় কোনও
হাঁটা চলা
কথা বলা
রেললাইনে মোবাইলে মনোযোগ
কেড়ে নিতে পারে অমূল্য জীবন
একটি ট্রেন চোখের নিমেষে ১৫ মিটার এবং
সেকেন্ডে ২৫ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে
রেললাইনের আশেপাশে মোবাইলে ব্যস্ত থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্প্রতি রেললাইনে বা প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে ফোনে কথা বলা বা মেসেজ পাঠানোর জন্য এবং চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে ঝুঁকে সেলফি বা গ্রুফি তোলার জন্য দুর্ঘটনায় কয়েকটি জীবনহানি ঘটেছে।
নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলুন
● রেললাইনে অথবা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলফি/গ্রুফি তুলবেন না।
● প্ল্যাটফর্মের বা রেললাইনের ধার ঘেঁষে চলার সময় কখনোই মোবাইলে কথা বলবেন না অথবা গান শুনবেন না।
● রেললাইনে হাঁটা বা হেঁটে পারাপার করা বিপজ্জনক। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
● রেললাইন অথবা ট্রেনের কাছ থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
● রেলওয়ে পরিসরে ক্যামেরা/মুভি ক্যামেরা/মোবাইল ফোন ক্যামেরার মাধ্যমে যে কোনো ধরণের ফটোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।
আরও দায়িত্বশীল হোন, সতর্ক হোন
INDIAN RAILWAYS
পূর্ব রেলওয়ে
আপনার সুরক্ষাই আমাদের লক্ষ্য

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

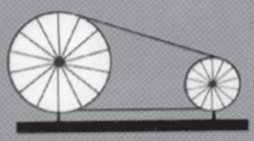

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

With Best Compliments from :

Manufacturer of ***Bulk Drugs & Chemicals***

Kothari Phytochemicals
&
Industries Limited

C-4, Gillander House, 8, N.S. Road, Kolkata - 700 001

Works at.

PHYTOCHEMICALS DIVISON - MADURAI

Vill- Nagari. P.O. - Thanichchiyam

Dist.- Madurai

Pin - 625 221, Tamil Nadu, India

CLARO INDIA DIVISON

B-7, Sipcot Industrial Complex, Gummidipoondi

Pin - 601 201, Tamil Nadu, India

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of -

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455

E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511

Fax : (91-6542) 253701

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

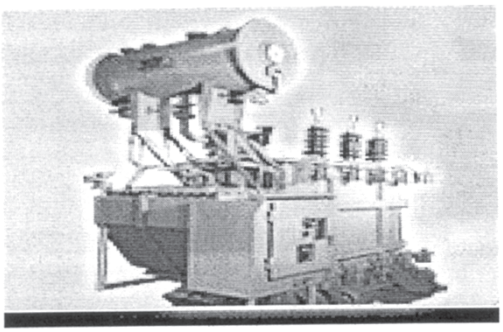

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS